প্রেম-ভক্তির রসঘনবিগ্রহ, সর্বযুগসমন্বয়ের দীপস্তম্ভ

অখণ্ড অমিয় শ্রী গৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গ্রন্থম্, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ
জুলাই, ১৯৬৩ (শ্রাবণ, ১৩৭০)

প্রকাশক
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সাহা
গ্রন্থম্
২২।১, কর্নওআলিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শিল্পী
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মূল্য : আট টাকা

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

'তৃণ হইতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনে-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিতবৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাইব॥
সদা নাম লইব যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ॥'

ভূমিকা

'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।' আর কিছুই করবার নেই কলিকালে, শুধু নাম শোনবার জন্যে একটু কান পেতে থাকা। সেটুকু ঔৎসুক্যও যখন নেই তখন ভগবান নিজেই কাঙাল সেজে জীবের দ্বারে-দ্বারে নাম বিলোতে বেরিয়েছেন। আমরা তাঁকে চাই না, কিন্তু তাঁর ভীষণ দায়, তিনি আমাদের চান। নিজে শুনবেন বলে আমাদের নাম শোনাচ্ছেন, নাম শেখাচ্ছেন। যদি আভাসেও আমাদের নাম আসে। তাই গৌরাঙ্গজীবনী লিখব এমন স্পর্ধা নেই—শুধু আভাসে নাম করবার জন্যে কিঞ্চিৎ লিখন-পঠন। শুধু সন্তরণে সিন্ধুগমনের চেষ্টা। 'পড়িলাম শুনিলাম এতদিন ধরি। কৃষ্ণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি॥'

অচিন্ত্যকুমার

৩৯

সন্ন্যাস গ্রহণের পর কাটোয়াতেই রাত্রি যাপন করলেন গৌরহরি। মুকুন্দকে বললেন, কীর্তন লাগাও।

প্রভুও নৃত্য করতে সুরু করলেন। শ্বাস হাস স্বেদ কম্প পুলক হুঙ্কার—প্রেমের সমস্ত বিকার আবির্ভূত হল। দণ্ড-কমণ্ডলু কোন দিকে গেল খেয়াল করলেন না। নাচতে নাচতে গুরুকে, কেশব ভারতীকে, আলিঙ্গন করলেন। সুকৃতি ভারতীও হরি-হরি বলে নাচতে লাগল। তাঁরও দণ্ড-কমণ্ডলু কোথায় গেল কে জানে।

ভারতীকে বললেন, 'আমাকে এবার বিদায় দিন। যেখানে গেলে আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে পাব আমি চললাম তার সন্ধানে।'

ভারতী বললেন, 'আমিও তোমার সঙ্গী হব।'

তখন চন্দ্রশেখরকে ধরে কাঁদতে লাগলেন গৌরহরি। বললেন, 'আপনি নবদ্বীপে ফিরে যান। সকলকে গিয়ে বলুন, আমি চলেছি বৃন্দাবন।'

যে বটগাছের তলায় বসে বিশ্রাম করলেন প্রভু, তার নাম হল বিশ্রামতলা।

প্রভু গোপীভাব ধরেছেন। আবিষ্ট হয়েছেন রাধাভাবে। কৃষ্ণকেই কান্ত বলে মেনেছেন। 'গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত। ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত।' সে কৃষ্ণ কী রকম? সে কৃষ্ণ শ্যামসুন্দর। সে কৃষ্ণের চূড়ায় শিখিপাখা, বুকে গুঞ্জামালা। সে কৃষ্ণ গোপবেশ, ত্রিভঙ্গিম, সে কৃষ্ণ মুরলীবদন। কৃষ্ণ যদি অন্য রূপ ধরে, এমন কি চতুর্ভুজ হয়েও দাঁড়ায়, গোপীভাব স্ফূর্তি পায় না, গোপীর রাগোল্লাস সঙ্কুচিত হয়।

বসন্তকালে গোবর্ধনে রাসলীলা করছে কৃষ্ণ। হঠাৎ রাধাকে সঙ্কেত করল, চলো দুজনে পালিয়ে যাই নিকুঞ্জে, নিভৃত হই। রাসস্থলী থেকে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হল, নিকুঞ্জে গিয়ে রাধার অপেক্ষা করতে লাগল। কোথায় কৃষ্ণ! গোপাঙ্গনারা চারদিকে খুঁজতে লাগল কৃষ্ণকে। দূর থেকে দেখল কৃষ্ণ নিকুঞ্জে গিয়ে বসেছে। কৃষ্ণও দেখল গোপীদের। কী হবে, ধরা পড়ে যাব। যদি, হায়, আমার এখন চার হাত হত! মনে ইচ্ছা করা মাত্র কৃষ্ণ চতুর্ভুজ হয়ে উঠল। গোপীরা এসে দেখল, এ কে? এ তো নারায়ণ। এ তো আমাদের প্রাণকান্ত কৃষ্ণ নয়। তাদের কান্তাভাব সঙ্কুচিত হল। নারায়ণকে নতিস্তুতি করে তারা কৃষ্ণের খোঁজে অন্য দিকে চলে গেল।

এমন সময় দেখা গেল রাধাকে। কৃষ্ণের ইচ্ছা হল চার হাতই মেলা থাক, রাধার সঙ্গে একটু কৌতুক হোক। কিন্তু সাধ্য কি, কৃষ্ণ সেই ঐশ্বর্যকে ধরে রাখতে পারে। রাধা যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই অতিরিক্ত দুই হাত সঙ্কুচিত হতে লাগল। শত চেষ্টা করে রাধার সামনে চতুর্ভুজ থাকতে পারল না। যে দ্বিভুজ সেই দ্বিভুজই হয়ে গেল। 'রাধার বিশুদ্ধ ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব। যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ-স্বভাব॥'

রাধিকাতেই প্রেমের পূর্ণতম স্ফূর্তি। ঐশ্বর্যলেশশূন্য মাধুর্যতরঙ্গিণী। তাই তাকে চমৎকৃত বা অপ্রতিভ করার জন্যে ঐশ্বর্যের বিকাশ সম্ভব নয়। শুদ্ধ মাধুর্যের প্রতিমূর্তি রাধার কাছে ঐশ্বর্য বিড়ম্বিত। সুতরাং স্বরূপসিদ্ধ দ্বিভুজ রূপ ধরো। 'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ।'

'গোপী, গোপী,' বলতে লাগলেন গৌরহরি।

সেই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ আপত্তি করেছিল, গোপীনাম জপা অশাস্ত্রীয়, বরং কৃষ্ণনাম জপলে ফল পেতে পারো, আর এই তান্ত্রিক আচার্যকে লাঠি হাতে মারতে গিয়েছিলেন গৌরচন্দ্র।

গোপীরা কী রকম ? 'স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোনো দাগ।' মূর্তিমতী নির্মলতা। তাদের স্বসুখবাসনা নেই, তারা কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ করে শুধু কৃষ্ণ সুখী হবে বলে। 'অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ। কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ ॥' তাদের আত্ম-সুখ-দুঃখের বিচার নেই, তাদের সমস্ত কষ্ট, সমস্ত মননচিন্তন কৃষ্ণসুখের উদ্দেশে। 'আত্ম-সুখ-দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণ-সুখহেতু চেষ্টা, মনোব্যবহার ॥' কৃষ্ণের জন্যে তারা বেদধর্ম লোকধর্ম আর্যপথ সব ছেড়েছে, শুধু সেবায়-ভালোবাসায় কৃষ্ণকে সুখী করার জন্যে। কৃষ্ণের বাইরে আর তাদের তৃষ্ণা নেই।

গোপীদের কাছেই কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হল। কী প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণের ? কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল যে যে ভাবে কৃষ্ণকে ভজন করবে, কৃষ্ণ তাকে সেই ভাবে কৃতার্থ করবে। অর্থাৎ ভজনকারী যা প্রার্থনা করবে কৃষ্ণের কাছে, কৃষ্ণ তাই তাকে দিয়ে দেবে। বাসনার অনুরূপ ফল দেবে কৃষ্ণ। কিন্তু, গোপীদের যে কণামাত্র বাসনা নেই। তাদের কৃষ্ণভজনের উত্তরে কৃষ্ণ তাদের আর কী ফল দিতে পারে ? কিছুই দিতে পারে না। তাই কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা মিথ্যে হয়ে যায়।

গোপীদের তাই বলছে কৃষ্ণ, দুর্জন গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছিন্ন করে তোমরা আমার ভজনা করেছ। নির্মলভজনপরায়ণা, তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার আমি কী করে করি ? অনন্ত আয়ুষ্কালেও তা আমি পারব না শোধ করতে। সুতরাং তোমাদের স্বীয় সাধুকৃত্যই তোমাদের কৃত সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার হোক।

সেই গোপীভাব, রাধাভাব শ্রীচৈতন্যের। 'অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি। ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি ॥' আবার সেই শ্যাম বংশীমুখ গোপবিলাসীই গৌর, যিনি কখনো দ্বিজ, কখনো সন্ন্যাসী।

এখন পশ্চিম দিকে চলেছেন মহাপ্রভু। আগে আগে কেশব ভারতী, পিছনে গোবিন্দ, দুই পাশে নিত্যানন্দ মুকুন্দ আর গদাধর। 'ভিক্ষুগীতা' আবৃত্তি করতে-করতে চলেছেন।

মালবদেশে ধনাঢ্য এক ব্রাহ্মণ ছিল। বাণিজ্য করে বিপুল ধন সঞ্চয় করেছিল, কিন্তু কৃপণ ছিল বলে অর্থ তার সুখের কারণ হল না। আপন পরিজনকে তো বটেই, নিজেকেও পর্যন্ত অর্থ সঞ্চয়ের লালসায় ভোগবঞ্চিত করে রাখত। তার পুত্র দুঃশীল, স্ত্রী-কন্যা বিষণ্ণ। কর্তব্যকর্মের অনাদরে সে পুণ্যভ্রষ্ট। দেবতারা তার প্রতি রুষ্ট হলেন। ফলে তার সমস্ত অর্থ ক্ষয় হয়ে গেল। তখন সন্তপ্ত ব্রাহ্মণ অনুতাপ করতে বসল। সেই অনুশোচনাই ভাগবতে 'ভিক্ষুগীতা' নামে আখ্যাত।

আমি বৃথাই আত্মাকে ক্লিষ্ট করেছি। আমার আত্মা না-ধর্মের নিমিত্ত না-কর্মের নিমিত্ত হল। বৃথা অর্থের নিমিত্তই এত কষ্ট স্বীকার করলাম। কুষ্ঠ যেমন বাঞ্ছিত রূপ নষ্ট করে, লোভ তেমনি সর্ব-যশোগুণনাশী হয়ে ওঠে। অর্থের উপার্জনে-উৎকর্ষে সঞ্চয়ে-রক্ষণে ব্যয়ে-নাশে মানুষের আয়াস ও ত্রাস, চিন্তা ও ভ্রম জন্মায়। আর এই অর্থ থেকেই চৌর্য হিংসা মিথ্যা শঠতা কাম ক্রোধ গর্ব মোহ ভেদ বৈর অবিশ্বাস ও স্পর্ধা—যাবতীয় অনর্থের আবির্ভাব। সুতরাং যে মঙ্গলকে চায় সে অর্থ নামক অনর্থকে পরিত্যাগ করে।

কি জন, কি দেবতা, কি আত্মা, কি গ্রহ, কি কর্ম, কি কাল, কিছুই আমার দুঃখের কারণ নয়, মনই একমাত্র দুঃখের কারণ। মন দ্বারাই সংসারচক্র পরিবর্তিত হচ্ছে। মনের দমনই পরম যোগ। মনঃসংযমই চিরসুখ ও চিরশান্তির মূল। যে মনকে বশে আনতে পারে সেই দেবদেব। মনঃপ্রসূত কর্ম আর সেই কর্মের ফলই আমরা ভোগ করছি।

নিজের দাঁত দিয়ে নিজের জিভ কামড়ালে কার প্রতি তুমি ক্রুদ্ধ হবে? কাকে তুমি দোষী করবে? তেমনি তুমি তোমার নিজের মনোযন্ত্রণায় জর্জর হচ্ছ। সুতরাং কাকে তুমি দায়ী করবে? তোমার সুখ-দুঃখ-প্রদাতা আর কেউ নয়, তুমি নিজে।

ব্রাহ্মণের নির্বেদ উপস্থিত হল। স্থির করল, প্রাচীনতম মহর্ষি-

গণের সেবিত পরমাত্মনিষ্ঠা আশ্রয় করে মুকুন্দের চরণ-সেবা দ্বারাই দুস্তর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হব।

দ্বিজসত্তম হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করল, মনঃসংযম করে ভিক্ষুব্রত নিয়ে পৃথিবী পর্যটন করতে লাগল। নষ্টধন গতশ্রম বৈরাগ্যাশ্রিত মুনি আর বিচলিত হল না।

কৃষ্ণ তাই বললে উদ্ধবকে, তুমি সর্বপ্রযত্নে একাগ্রচিত্ত হয়ে আমার প্রতি বুদ্ধি সংন্যস্ত করে মনঃসংযম করো। আর যে এই ভিক্ষুগীতা শুনবে বা শোনাবে বা অনুধাবন করবে, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে সে আর অভিভূত হবে না।

ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি অনিদ্রা কিছুই মানছেন না গৌরাঙ্গ, বৃন্দাবনের ভাবে বিভোর হয়ে পথ চলেছেন। কোথায় পথ, কত দূরে বৃন্দাবন তা কে জানে। যে দিকেই যান না কেন নিত্যানন্দ সঙ্গ ছাড়ছে না। গোবিন্দ মুকুন্দ গদাধরও চলেছে পিছে পিছে।

গ্রামের লোকও এসে দলে জুটছে। প্রভু তাদের ঘরে ফিরে যেতে বলছেন। বলছেন, ঘরে গিয়ে সকলে হরিনাম করো। কৃষ্ণচন্দ্র সকলের ধন-প্রাণ হোক। যে রস শিব-শুকেরা আকাঙ্ক্ষা করে তোমাদের শরীরে সে রসের উদ্ভব হোক।

রাঢ়ে প্রবেশ করলেন গৌরহরি। কিন্তু কী আশ্চর্য, তিন দিন রাঢ়েই ঘুরে বেড়ালেন,বৃন্দাবনের দিকে এক পা-ও এগোতে পারলেন না। দুক্রোশ যদি সামনে হাঁটেন, দুক্রোশ আবার পিছু হটেন। বললেন, বক্রেশ্বর যাব। অথচ পৌঁছুতে পারলেন না বক্রেশ্বর। তিন দিন তিন রাত হাঁটছেন অবিশ্রাম অথচ এগোতে পারছেন না, নবদ্বীপের কাছাকাছিই আছেন। নবদ্বীপের লোকেরাই বুঝি তাঁকে টানছে, যেতে দিচ্ছে না।

প্রীতিতে আবদ্ধ করে রাখছে ভগবানকে।

দিক-বিদিকের জ্ঞান নেই, দিবা-রাত্রির জ্ঞান নেই, জ্ঞান নেই পথ-বিপথের। শুধু একমাত্র জ্ঞান হরিনাম। পশ্চিম মুখে গিয়ে

আবার পূর্বমুখ হচ্ছেন, পূর্বমুখ থেকে আবার পশ্চিমমুখ, কিন্তু, কই, কারু মুখে তো কৃষ্ণ নাম শুনছি না। রাঢ়ে কোথায় ভক্তি, কোথায় কীর্তন, কোথায় প্রেমাবেশ !

'প্রভু বোলে, হেন দেশে আইলাঙ কেনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম কারো না শুনি বদনে॥
কেনে হেন দেশে মুঞি করিলুঁ প্রয়াণ।
না রাখিমু দেহ মুঞি ছাড়োঁ এই প্রাণ॥'

মাঠে কতগুলি রাখাল ছেলে গরু চরাচ্ছিল, তারা হঠাৎ হরি-হরি বলে উঠল।

আচম্বিতে শিশুকণ্ঠে হরিনাম শুনে উৎফুল্ল হলেন গৌরহরি। ভাবলেন, তবে এরাই বুঝি সেই ব্রজের রাখাল। বৃন্দাবন তবে আর দূরে নয়।

গৌরহরি বালকগুলির মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, 'হরিনাম শুনিয়ে আমার বড় উপকার করলে। তোমরা খুব ভালো, দয়া করে আমার আরেকটা উপকার করবে?'

'বলুন, কী উপকার?'

'বৃন্দাবনের পথ আমাকে দেখিয়ে দেবে?'

অদূরে দাঁড়িয়ে নিত্যানন্দ বালকদের ইসারা করল যেন গঙ্গার দিকের পথ দেখিয়ে দেয়।

সরলস্বভাব বালকেরা তাই করলে। শান্তিপুরের পথ দেখিয়ে দিল।

নামের আবেশে প্রভু চললেন শান্তিপুরের দিকে।

ওরে আমার ব্রজের রাখাল বন্ধুরা, তোরা কোথায় পেলি এ হরিনাম? এ নাম তোদের কে শেখাল? আমি বৃন্দাবনে যাচ্ছিলাম, ছুটে এলাম তোদের নাম শুনে। আমি মরে ছিলাম, নাম শুনে প্রাণ পেলাম। আমার কান উপবাসী ছিল, রসায়নে জীবন পেল এতক্ষণে।

চন্দ্রশেখর এখনো সঙ্গ ছাড়েন নি বুঝি। নিত্যানন্দ তাকে বললে, 'তুমি শিগগির শান্তিপুরে চলে যাও, অদ্বৈত আচার্যকে খবর দাও। অদ্বৈত যেন এ পারে নৌকো নিয়ে প্রস্তুত থাকে।'

চন্দ্রশেখর চলে যাচ্ছিল, তাকে আবার ডাকল নিত্যানন্দ। বললে, 'শোনো, তারপর তুমি নবদ্বীপে যাবে। খবর দেবে শচীমাতাকে।'

চন্দ্রশেখর চলে গেলে নিত্যানন্দ পিছন থেকে এসে প্রভুর সামনে দাঁড়াল। বললে, 'প্রভু, আমি নিত্যানন্দ।'

প্রেমাবেশে বাহ্যস্মৃতি নেই, গৌরহরি বুঝতেও পারেন নি নিত্যানন্দ তাঁর পিছনে-পিছনে আসছে।

চমক ভাঙল গৌরহরির। বললেন, 'শ্রীপাদ, তুমি কোত্থেকে আসছ ?'

নিত্যানন্দ বললে, 'আমিও যে তোমার সঙ্গে বৃন্দাবন চলেছি।'

'কোথায়, কোথায় আমার বৃন্দাবন ? আর কতদূর ?'

বৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণি দিয়ে তৈরি। চিন্তামণি কী ? চিন্তামণি একরকম বহুমূল্য পাথর, তার কাছে যা চাওয়া যায় তাই মেলে। 'ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী।' আর বৃন্দাবনের সমস্ত গাছই কল্পতরু। যদি চর্মচক্ষে দেখ, তোমার কাছে তা প্রাকৃত রূপেই প্রতিভাত হবে। তাকে সাধারণ মাটি সাধারণ গাছ বলেই চিনবে। কিন্তু যদি প্রেমনেত্রে তাকাও দেখবে এখানেই কৃষ্ণ গোপ-গোপীর সঙ্গে বিলাস করছেন, গো-পালন করছেন। বিরাজ করছেন গোবিন্দ রূপে।

বলো, আর কতদূর বৃন্দাবন ? আমাকে কি দর্শন দেবেন কৃষ্ণ ? আমি বৃন্দাবনে গিয়ে মাধুকরী করে খাব। জয় রাধে বলে রাধাকুণ্ডের ধুলোয় গড়াগড়ি দেব। আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

'এই তো এসে গেলাম বৃন্দাবন।'

'শ্রীপাদ, এই নদী কী ?'

'এই নদীই তো যমুনা।'

আবার পূর্বমুখ হচ্ছেন, পূর্বমুখ থেকে আবার পশ্চিমমুখ, কিন্তু, কই, কারু মুখে তো কৃষ্ণ নাম শুনছি না। রাঢ়ে কোথায় ভক্তি, কোথায় কীর্তন, কোথায় প্রেমাবেশ!

'প্রভু বোলে, হেন দেশে আইলাঙ কেনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম কারো না শুনি বদনে॥
কেনে হেন দেশে মুঞি করিলুঁ প্রয়াণ।
না রাখিমু দেহ মুঞি ছাড়োঁ এই প্রাণ॥'

মাঠে কতগুলি রাখাল ছেলে গরু চরাচ্ছিল, তারা হঠাৎ হরি-হরি বলে উঠল।

আচম্বিতে শিশুকণ্ঠে হরিনাম শুনে উৎফুল্ল হলেন গৌরহরি। ভাবলেন, তবে এরাই বুঝি সেই ব্রজের রাখাল। বৃন্দাবন তবে আর দূরে নয়।

গৌরহরি বালকগুলির মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, 'হরিনাম শুনিয়ে আমার বড় উপকার করলে। তোমরা খুব ভালো, দয়া করে আমার আরেকটা উপকার করবে?'

'বলুন, কী উপকার?'

'বৃন্দাবনের পথ আমাকে দেখিয়ে দেবে?'

অদূরে দাঁড়িয়ে নিত্যানন্দ বালকদের ইসারা করল যেন গঙ্গার দিকের পথ দেখিয়ে দেয়।

সরলস্বভাব বালকেরা তাই করলে। শান্তিপুরের পথ দেখিয়ে দিল।

নামের আবেশে প্রভু চললেন শান্তিপুরের দিকে।

ওরে আমার ব্রজের রাখাল বন্ধুরা, তোরা কোথায় পেলি এ হরিনাম? এ নাম তোদের কে শেখাল? আমি বৃন্দাবনে যাচ্ছিলাম, ছুটে এলাম তোদের নাম শুনে। আমি মরে ছিলাম, নাম শুনে প্রাণ পেলাম। আমার কান উপবাসী ছিল, রসায়নে জীবন পেল এতক্ষণে।

চন্দ্রশেখর এখনো সঙ্গ ছাড়েন নি বুঝি। নিত্যানন্দ তাকে বললে, 'তুমি শিগগির শান্তিপুরে চলে যাও, অদ্বৈত আচার্যকে খবর দাও। অদ্বৈত যেন এ পারে নৌকো নিয়ে প্রস্তুত থাকে।'

চন্দ্রশেখর চলে যাচ্ছিল, তাকে আবার ডাকল নিত্যানন্দ। বললে, 'শোনো, তারপর তুমি নবদ্বীপে যাবে। খবর দেবে শচীমাতাকে।'

চন্দ্রশেখর চলে গেলে নিত্যানন্দ পিছন থেকে এসে প্রভুর সামনে দাঁড়াল। বললে, 'প্রভু, আমি নিত্যানন্দ।'

প্রেমাবেশে বাহ্যস্মৃতি নেই, গৌরহরি বুঝতেও পারেন নি নিত্যানন্দ তাঁর পিছনে-পিছনে আসছে।

চমক ভাঙল গৌরহরির। বললেন, 'শ্রীপাদ, তুমি কোত্থেকে আসছ?'

নিত্যানন্দ বললে, 'আমিও যে তোমার সঙ্গে বৃন্দাবন চলেছি।'

'কোথায়, কোথায় আমার বৃন্দাবন? আর কতদূর?'

বৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণি দিয়ে তৈরি। চিন্তামণি কী? চিন্তামণি একরকম বহুমূল্য পাথর, তার কাছে যা চাওয়া যায় তাই মেলে। 'ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী।' আর বৃন্দাবনের সমস্ত গাছই কল্পতরু। যদি চর্মচক্ষে দেখ, তোমার কাছে তা প্রাকৃত রূপেই প্রতিভাত হবে। তাকে সাধারণ মাটি সাধারণ গাছ বলেই চিনবে। কিন্তু যদি প্রেমনেত্রে তাকাও দেখবে এখানেই কৃষ্ণ গোপ-গোপীর সঙ্গে বিলাস করছেন, গো-পালন করছেন। বিরাজ করছেন গোবিন্দ রূপে।

বলো, আর কতদূর বৃন্দাবন? আমাকে কি দর্শন দেবেন কৃষ্ণ? আমি বৃন্দাবনে গিয়ে মাধুকরী করে খাব। জয় রাধে বলে রাধাকুণ্ডের ধুলোয় গড়াগড়ি দেব। আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

'এই তো এসে গেলাম বৃন্দাবন।'

'শ্রীপাদ, এই নদী কী?'

'এই নদীই তো যমুনা।'

গঙ্গায় যমুনা-জ্ঞান হল গৌরহরির। যমুনার স্তব করতে লাগলেন।

নির্বিশেষ ব্রহ্ম তোমার অঙ্গকান্তি, তুমি নন্দ-নন্দন কৃষ্ণের পর-প্রেমপাত্রী, তুমি দ্রবব্রহ্মগাত্রী, সর্বপাপবিনাশিনী, জগৎকল্যাণ-কারিণী, তুমি সূর্যকন্যা, তুমি আমাদের দেহ পবিত্র করো। তোমাকে নমস্কার করি।

'অহো ভাগ্য, যমুনার দর্শন পেলাম।' বলে যমুনায় ঝাঁপ দিলেন মহাপ্রভু।

একখানি কৌপীন মাত্র পরিধানে, প্রভু স্নানান্তে তীরে উঠে সিক্ত গাত্রে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরিধানের দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। তবে এখন উপায় কী!

নৌকোয় করে অদ্বৈত ততক্ষণ পৌঁছে গেছে এপারে। সে নতুন কৌপীন ও বহির্বাস নিয়ে এসেছে।

অদ্বৈতকে দেখে প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ফুটে উঠতে চাইল। 'এ কী, অদ্বৈত আচার্যকে দেখছি না?' প্রভু এগোলেন দু'-পা। 'হ্যাঁ, অদ্বৈতই তো। তুমি বৃন্দাবনে কী করে এলে? আমি বৃন্দাবনে আছি এ তুমি কী করে জানলে?'

অদ্বৈত বললে, 'যেখানে তুমি সেখানেই বৃন্দাবন।'

যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই তাঁর নিজ-ধাম।

'এ আমি তবে কোথায় এলাম?' প্রভু তাকাতে লাগলেন চার দিক।

'আমার পরম ভাগ্য।' বললে অদ্বৈত, 'তুমি গঙ্গাতীরে এসেছ।'

এই সেই সকলকলুষভঙ্গা জাহ্নবী। শঙ্করমৌলিবিহারিণী নরক-নিবারিণী অলকানন্দা।

'এ কী, নিত্যানন্দ আমাকে ঠকিয়ে গঙ্গাতীরে নিয়ে এসেছে।' প্রভুর বাহ্য সম্বিৎ ফিরে এল।

'প্রভু কহে—নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গায় আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা ॥'

আচার্য বললে, 'নিত্যানন্দের কথা মিথ্যা নয়। তুমি এখন যমুনাতেই স্নান করলে।'

প্রয়াগে গঙ্গার সঙ্গে যমুনার মিলন হয়েছে, পশ্চিমে যমুনা, পুবে গঙ্গা। যমুনাধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছে গঙ্গাধারা। আর তুমিও গঙ্গার পশ্চিমেই স্নান করলে। সুতরাং এই গঙ্গাস্নানই তোমার যমুনাস্নান।

নিত্যানন্দের প্রতি অভিমান প্রকাশ করলেন গৌরহরি। 'তুমি আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে এলে। তুমি জাহ্নবীকে দেখিয়ে বললে ঐ যমুনা। মধুবনচারিণী কলিন্দনন্দিনী। তুমি ভাই হয়ে এ কী করলে? আমাকে ব্রজে যেতে দিলে না। আমার খেলার সাথিরা সব সেখানে চলে গিয়েছে, শুধু আমারই যাওয়া হল না। আমি কার জন্যে তবে সন্ন্যাসী হলাম। যার জন্যে সন্ন্যাসী হলাম তাকে আর তবে পেলাম কই?'

অদ্বৈত বললে, 'নিতাই তোমাকে ভোলায় তার সাধ্য কী! তুমি কত বড় ভক্তবৎসল তাই সে প্রমাণ করল।'

'সে প্রমাণ করল আমি তার হাতের পুতুল। সে নাচালেই আমি নাচি।'

'যারা তোমার নিজ জন তাদের তুমি করুণা করবে না?' প্রকাশ্যে এগিয়ে এল নিতাই। 'জীবে করুণা করতে উদয় হলে অথচ তোমার নিজ জন তা পাবে না আস্বাদ করতে?'

'প্রভু, আমাদের প্রতি সদয় হও।' মিনতিভরা স্বরে বললে অদ্বৈত, 'শুষ্ক বাস পরিধান করো। আমার নৌকোয় ওঠো। তিন দিন তুমি উপবাসে আছ। আমার ঘরে গিয়ে ভিক্ষে নাও। প্রাণটুকু রাখো শরীরে।'

গৌরহরি তখন শুষ্ক বাস পরিধান করে নৌকোয় গিয়ে উঠলেন।

শান্তিপুরের ঘাটে নৌকো এসে লাগল।

নিতাই বললে, 'তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলো। ভগবানের আকর্ষণে এত লোক এসে জুটবে ভিড় সামলাতে পারবে না।' ঘরে এসে পৌঁছুলে আবার বললে, 'দরজায় দ্বারী বসাও, নইলে ভক্তের চাপে তোমার বাড়ি-ঘর চূর্ণ হয়ে যাবে।'

অদ্বৈত-গৃহিণী সীতা দেবী ভোগ সাজালেন। ভোগ তিন জনের জন্যে, তিন পাত্রে। কৃষ্ণের জন্যে ধাতু-পাত্রে আর নিমাই ও নিতাইয়ের জন্যে দুই কলা-পাতায়।

অনেক রকম ব্যঞ্জন রেঁধেছেন সীতা দেবী। পিঠে পায়েস দধি ক্ষীর—কী নয়! অন্ন-ব্যঞ্জনের উপর তুলসী-মঞ্জরী রাখল। সুবাসিত জল ভরল তিন পাত্রে। তিন শুভ্রপীঠ স্থাপন করল। প্রথমে কৃষ্ণকে ভোগ দিল। আরতি করল। আরতির সময় দাঁড়াল এসে নিমাই-নিতাই। নির্নিমেষে দেখল আরতি। আরতি-অন্তে শয়ন দিল কৃষ্ণকে।

প্রভু বললেন, 'মুকুন্দ কই? হরিদাস কই? ওদের ডাকো।'

মুকুন্দ কাছে এল। বললে, 'আমার নিত্যকৃত্য এখনো কিছু করা হয়নি। আমি পরে প্রসাদ নেব।'

হরিদাসও সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, 'আমি অধম পাপিষ্ঠ, আমি বাইরে বসে এক মুঠ খেয়ে নেব।'

নিমাই-নিতাই অন্তঃপুরে গেল। কৃষ্ণভোগের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দেখে আনন্দিত গৌরহরি, নিজে খাবেন বলে নয়। বললেন, 'এমন করে যে কৃষ্ণকে খাওয়ায় আমি তার পদবন্দনা করি।' 'ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণেরে করায় ভোজন। জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাহার চরণ॥' অদ্বৈতকে বললেন, 'তুমিও বসে পড়ো, তিন জনে খাই।'

অদ্বৈত বললে, 'না, আমি পরিবেশন করব।'

হাতে ধরে নিমাই-নিতাইকে দুই শুভ্র পীঠে—শাদা কাপড় দিয়ে মোড়া কাঠের পিঁড়িতে বসিয়ে দিল।

প্রভু বললেন, 'অন্ন-অন্ন দাও। এত সব উৎকৃষ্ট উপকরণ সন্ন্যেসীর ভক্ষ্য নয়। এত সব সুস্বাদু দ্রব্য খেলে ইন্দ্রিয়দমন হবে কী করে?'

'প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয়বারণ॥'

আচার্য বললে, 'তোমার চাতুরী রাখো। তোমার আসল কথা আমি সব টের পেয়েছি।' 'আচার্য কহেন—ছাড় তুমি আপনার চুরি। আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি॥'

ভগবানের আবার সন্ন্যাসের প্রয়োজন কী? যিনি মায়াধীশ তাঁর কি আবার সংসারবন্ধন আছে? তাঁর আবার কিসের ইন্দ্রিয়-সংযম? নিন্দুক ও তার্কিকদের উদ্ধারের জন্যেই তিনি সন্ন্যাসবেশ ধরেছেন। হয়তো বা আত্মগোপনের চেষ্টায়। নইলে যিনি নিজে সাধন-ভজনের লক্ষ্য তিনিই কিনা সাধারণ সাধক সন্ন্যাসী সেজেছেন! এ লীলার তাৎপর্য বুঝতে অদ্বৈতের আর বাকি নেই!

অদ্বৈত বললে, 'ও সব বচনচাতুরী ছাড়ো। সামান্য জিনিস, খেলে কিছু দোষ হবে না।'

'এত খাব কী করে?' তবু আপত্তি করলেন প্রভু।

'যা পারবে না পাতে থাকবে।'

'উচ্ছিষ্ট রাখা সন্ন্যেসীর ধর্ম নয়।'

'রাখো। নীলাচলে যে চুয়ান্ন বার ভোগ খাও। সেখানে তোমার এক গ্রাস এখানকার তিনজনের আহার্য। রাখো, চাতুরী ছাড়ো, হাত লাগাও।' অদ্বৈত দুই অতিথির হাতে জল ঢেলে দিল।

নিত্যানন্দ অন্য সুর ধরল। বললে, 'তিন দিন উপবাসের পর ভেবেছিলাম পেট পুরে খেতে পাব। এখন যা আয়োজন দেখছি তাতে মনে হচ্ছে পেটের আদ্ধেকও ভরবে না।'

অদ্বৈত বললে, 'তুমি তো তীর্থবাসী সন্ন্যাসী, সকল সময়ে আহারও জোটে না। তোমার আবার পেট ভরবে কী! তুমি তো

ফলমূল খেয়ে থাকো। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে যা এক মুঠো ভাত পেয়েছ তাই খাও তৃপ্তি করে। লোভ করা ভালো নয়।'

'বা, বেশ বলেছ।' পরিহাস করল নিমাই। 'নিমন্ত্রণ করে এনে বলছ, এক মুঠো খাও। মোটেই তা চলবে না। যত চাই তত দিতে হবে। পেট ভরাতে হবে।'

'তুমি তো এক ভ্রষ্ট অবধূত।' ক্রুদ্ধ হল অদ্বৈত, 'তুমি বুঝি সন্ন্যাস করেছ গৃহস্থকে দণ্ড দিতে। তুমি যেমন ঔদরিক, তুমি একাই দশ-বিশ মণ ভাত সাবাড় করতে পারো, আমি গরিব ব্রাহ্মণ, আমি অত পাব কোথায়? যা পেয়েছ তাই খেয়ে তৃপ্ত হও। আর দয়া করো, উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ো না।'

নানা যত্নে-দৈন্যে খাওয়াতে লাগল অদ্বৈত। বললে, 'যা দিয়েছি কিছু ফেলতে পারবে না।'

আচার্যের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন প্রভু। কিন্তু নিতাই বললে, 'আমার পেট ভরল না। যা সামান্য দিয়েছ তা নিয়ে যাও ফিরিয়ে।' বলে এক গ্রাস ভাত নিয়ে অদ্বৈতের গায়ে ছুঁড়ে মারল।

আশ্চর্য, অদ্বৈত আচার্য নাচতে লাগল। বললে, 'অবধূতের উচ্ছিষ্ট আমার গায়ে লাগল, আমি পবিত্র হলাম।'

নিত্যানন্দ বললে, 'তুমি একে উচ্ছিষ্ট বলো কোন্ হিসেবে? এ তো কৃষ্ণের প্রসাদ। কৃষ্ণের প্রসাদকে উচ্ছিষ্ট বলে তুমি অপরাধী হলে। আমার মত এক-শো সন্ন্যাসীকে পেট পুরে খাওয়ালেই তবে এ অপরাধের খণ্ডন হবে।'

'আবার সন্নেসীকে খাওয়াব? রক্ষে করো। সন্নেসীর সঙ্গ করে আমার ধর্ম-কর্ম সব গেল। আর নয়।'

হাসতে লাগল নিতাই। হাসতে লাগল নিমাই।

তারপর দু'জনে আচমন করল। তুলসীমঞ্জরীসহ লবঙ্গ এলাচি কবাবচিনি মুখশুদ্ধি দিল অদ্বৈত। এবার তবে শয়ন করো।

প্রভুকে শয্যায় আনা হল। অদ্বৈত প্রভুর গায়ে চন্দন মেখে

দিল। বুকের উপর দুলিয়ে দিল ফুলমালা। তারপর পদতলে বসে চাইল পা টিপে দিতে।

সঙ্কুচিত হলেন প্রভু। বললেন, 'না, এবার ছাড়ো। অনেক নাচিয়েছ আমাকে, আর নাচে কাজ নেই। এখন মুকুন্দ হরিদাসকে নিয়ে খেতে বোস।'

কতক্ষণ পরেই দলে-দলে লোক আসতে লাগল। এ কী দেখছি চোখ মেলে। এখন চমৎকার সৌন্দর্য তো আর দেখিনি।

'গৌর দেহকান্তি—সূর্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ বস্ত্রকান্তি তাতে করে ঝলমল॥'

লোক-সমাগমে অদ্বৈতপুরী তীর্থেরও অধিক হয়ে উঠল। সন্ধ্যায় কীর্তন ধরল আচার্য।

'কি কহব রে সখি! আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।
আর হাম প্রিয় দূরদেশে না পাঠাও।
আঁচল ভরিয়া যদি ধন পাও॥'

আঁচল ভরে যখন টাকা পেয়েছি তখন কী কারণে কিসের উপার্জনে প্রিয়কে পাঠাব দূর দেশে! আমার প্রিয়তমের চেয়ে কি টাকা প্রিয়তর?

৪।

গান গাইছে আর নাচছে অদ্বৈত। ভাবাবেশে প্রভু বাহ্যস্মৃতিহীন। সেই সাহসে অদ্বৈত বারে বারে তাঁর পা স্পর্শ করছে। আর বলছে, 'এত দিন এই দীর্ঘ চব্বিশ বছর সবাইকে ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপন

করে ছিলে, এবার তোমাকে আমার ঘরের মধ্যে পেয়েছি, এবার বেঁধে রাখব আষ্টেপিষ্টে।'

যত গান শুনছেন তত কৃষ্ণসঙ্গের জন্যে ব্যাকুল হচ্ছেন প্রভু, ততই বাড়ছে বিরহকষ্ট। শেষ পর্যন্ত পড়লেন ভূতলে। তখন অদ্বৈত তার নাচ বন্ধ করল। কিন্তু মুকুন্দ জানে প্রভুর অন্তরের ভাব কী। সেই অনুসারে সে গান ধরল :

'হাহা প্রাণ প্রিয়সখি কি না হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে॥
রাত্রি-দিনে পোড়ে মন, সোয়াস্তি না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাহাঁ উড়ি যাঙ॥'

কিন্তু ফল কী হল? প্রভুর চিত্ত বিদীর্ণ হল। দেখা দিল বহু বিচিত্র ভাব। নির্বেদ আর বিষাদ, অমর্ষ আর চাপল্য, গর্ব আর দীনতা। ভাবের প্রহারে জর্জর প্রভু আবার লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। শরীরে শ্বাস নেই।

নির্বেদ কী? দুঃখে, বিরহে ও ঈর্ষায় নিজের প্রতি যে অবমাননা-জ্ঞান, তাই নির্বেদ। বিষাদ কী? ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি বা অপরাধ থেকে যে অনুতাপ, তাই বিষাদ। অমর্ষ কী? তিরস্কার বা অপমানের ফলে যে অসহিষ্ণুতা, তার নাম অমর্ষ। আর চাপল্য? রাগদ্বেষের ফলে চিত্তের লঘুতা বা গাম্ভীর্য-হীনতার নাম চাপল্য। গর্ব কী? সৌভাগ্য, রূপ, যৌবন, গুণ বা ইষ্টলাভহেতু অন্যের প্রতি যে অবজ্ঞা, তাই গর্ব। আর দৈন্য কাকে বলে? দুঃখে ও ত্রাসে বা অপরাধীবোধে নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করাই দৈন্য।

প্রভুর এ অবস্থা দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

আচম্বিতে প্রভু হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন : বলো, বলো, আরো বলো। যেখানে গেলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, সেখানে উড়ে যাব পাখা মেলে। কোথায় কৃষ্ণ!

'শুন মোর প্রাণের বান্ধব।
নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন   দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥'

দরিদ্র যেমন ধনের অভাবে তার পরিবারের লোকদের ভরণ-পোষণ করতে পারে না, আমারও তেমনি প্রেমের অভাবে আমার দেহ, আমার ইন্দ্রিয় রইল নিষ্ফল অনশনে। যদি তাদের দিয়ে কৃষ্ণসেবাই করতে না পারি তাহলে তারা তো নিরর্থক। আর প্রেম বিনা শুধু দেহে শুধু ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা হয় কী করে?

আবার প্রবল ভাবতরঙ্গ উপস্থিত হল। কখনো হর্ষে কখনো বিষাদে উদ্দণ্ড নাচতে লাগলেন প্রভু। তিন দিন উপোসের পর আজ প্রথম আহার করেছেন, তারপর এই দীর্ঘ নৃত্য, প্রভু ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু প্রেমাবেশে ক্লান্তির অনুভব কোথায়? নিত্যানন্দ ধরে রইল নিমাইকে আর অদ্বৈত তাকে শয্যায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল।

কতক্ষণ পরে নিতাই জিগগেস করল নিমাইকে: 'একবার নবদ্বীপ যাব?'

'কেন?' চোখ তুলে তাকালেন গৌরহরি।

'মা এখনো বেঁচে আছেন কিনা একবার খোঁজ নিয়ে আসি।' নিতাই বললে, 'আমরা তো আজ মুখে অন্নজল দিলাম, কিন্তু মা বোধ হয় এখনো কিছু খাননি। তোমার শ্রীবাস মুরারিও হয়তো উপবাসে আছে।'

'যাও, দেখে এস।'

'যদি তারা কেউ আসতে চায়, নিয়ে আসব সঙ্গে করে?'

'যে-যে আসতে চায় নিয়ে এস।'

'হ্যাঁ, জানি, শুধু মা আসবেন। বিষ্ণুপ্রিয়া আসবে না। সে চাইবেই না আসতে।'

সে শুধু আমার পাদুকা নিয়ে জীবনযাপন করবে। তার সর্বাঙ্গ

সে প্রভুকে অর্পণ করেছে, এই অজ প্রভুর বস্তু, সুতরাং একে পালন-পোষণ করতে হবে। বিষ্ণুপ্রিয়াই তো আমার অনপায়িনী শ্রী, মনুষ্যনাট্যে ভক্তিস্বরূপা। ও কেন বিচলিত হবে? ওর তো নিজের সুখের জন্যে আকিঞ্চন নেই। ও বিশুদ্ধ প্রেমোল্লাস। গৌরশূন্য গৌরগৃহের মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে ও মূর্তিমতী নীরবতা।

পরদিন সকালে দোলায় চড়ে এলেন শচীমাতা। সঙ্গে চন্দ্রশেখর আচার্য।

না, বিষ্ণুপ্রিয়া আসেনি। সে আসবে কেন? সে যে সর্বত্যাগিনী পরাভক্তি। তার দুঃখেই সে যে আমার শিক্ষাকে মহনীয় করতে এসেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গের প্রাণ বিষ্ণুপ্রিয়া। স্থানে-কালে ব্যবধান নেই। সর্বাঙ্গ অবিচ্ছেদ।

বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ণশক্তি। সেই সর্বশক্তি-গরীয়সীর প্রাণবল্লভ বলেই গৌরহরি পূর্ণশক্তিমান।

আঙিনায় দোলা থেকে নামলেন শচীমাতা। আর তক্ষুনি প্রভু ছুটে এসে মার চরণে দণ্ডবৎ হলেন।

এ কি, সন্নেসী হয়ে মাকে প্রণাম করল? সন্নেসীর তো সন্নেসী ছাড়া আর কাউকে প্রণাম করা বারণ। তবে নিমাই ও করল কী?

মার সামনে কোনো নিয়মকানুন নেই। পুত্র সন্নেসী হলেও মা—মা।

শচীদেবী নিমাইকে কোলে তুলে নিলেন। কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। মাথার চুল নেই দেখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। বাৎসল্যভরে নিমাইয়ের গা মুছে দিলেন, মুখে চুমু খেলেন, একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে কিছুই আর দেখতে পেলেন না, দু'চোখ যে অশ্রুতে ভরে উঠেছে।

'শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া॥

গৌহার দর্শনে গৌহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥
অঙ্গ মোছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায়—অশ্রু ভরিল নয়ন॥'

শচী দেবী বললেন, 'নিমাই, বাবা, বিশ্বরূপের মত নিষ্ঠুর হয়ো না। সন্নেসী হয়ে আর সে আমায় দর্শন দিল না। তুমিও যদি তেমনি করো, আমাকে আর দেখা না দাও, তা হলে আমি বাঁচব না কিছুতেই।'

'মা গো, শোনো,' গৌরহরি বললেন, 'এই শরীর দেখছ, এ তো তোমারই। তোমার থেকেই এর জন্ম, তোমার হাতেই এর লালন-পালন। কোটি জন্মেও ঋণ শোধ করতে পারব না। সন্ন্যাস নিলে কী হবে, তোমার প্রতি উদাসীন থাকব না। যেখানে থাকতে বলো সেখানেই বসবাস করব, তোমার কথার অন্যথা করব না।'

'জানি বা না কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ, সেই তো করিব॥'

দলে দলে লোক এসেছে নবদ্বীপ থেকে, তাদের প্রাণধন নিমাইকে দেখতে। এসেছে শ্রীবাস, এসেছে রামাই, এসেছে বিদ্যানিধি। কে নয়? এসেছে গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, শুক্লাম্বর, মুরারি। নন্দন আচার্য, বুদ্ধিমন্ত খান, দামোদর, বাসুদেব। শ্রীধর, বিজয়, সঞ্জয়, মুকুন্দ। কত আর নাম করব? সে এক বিপুল সমাবেশ।

আহা, নিমাইয়ের মাথায় চুল নেই, কিন্তু দেখ দেখ কী অপার সুন্দর! এত রূপ কি মানুষের হয়, না, আর কারো? 'কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুখ। সৌন্দর্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ॥' সত্যি, এ কী আনন্দসাগর! এ সাগরের তল নেই, পার নেই, অন্ত নেই কোনোখানে।

কিন্তু এ কী বলল শচীমাতাকে? বলল, মা যেখানে থাকতে বলবেন সেখানেই সে বাস করবে। তা হলে শচীমাতা তাকে নবদ্বীপেই থাকতে বলুন না কেন? নিমাই সর্বক্ষণ থাকবে আমাদের চোখের উপর।

কিন্তু শচীমাতা কি তাই বলবেন? যদি নবদ্বীপে থাকলে সন্ন্যাসী নিমাইয়ের নিন্দে হয়? মা হয়ে ছেলের নিন্দে সইব কী করে?

শুনি না নিমাই কী বলে?

ভক্তদের একত্র করে প্রভু বললেন, 'তোমাদের না জানিয়েই যাচ্ছিলাম বৃন্দাবন, কিন্তু যাওয়া হল না, বিঘ্ন আমাকে ফিরিয়ে আনল। আমি সন্ন্যাস নিলে হবে কী, তোমাদের আমি ছাড়ব না, ছাড়ব না মাকে। কিন্তু বলো, যাই কোথা, থাকি কোথা? নিজ জন্মস্থানে আত্মীয়দের নিয়ে থাকা তো সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়।'

'তোমা সভা না ছাড়িব—যাবৎ আমি জীবো।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥'

ভক্তদের মুখ শুকিয়ে গেল। এখন শচীমাতা কী বলবেন?

শচীমাতা বললেন, 'ও যদি এখানে থাকে তা হলে তো আমার সুখের অন্ত নেই, কিন্তু এখানে থাকলে যদি ওর ধর্মচ্যুতি হয়, লোকে যদি ওকে নিন্দে করে, তা হলে আমার তা সহ্য হবে না।'

তবে উপায়?

'এমন উপায় করো, যাতে দুই ধর্মই বজায় থাকে।' বললেন গৌরহরি, 'আমার জন্মস্থানেও থাকা হয় না, তোমাদেরও ত্যাগ করতে হয় না।'

সে উপায়ও শচীমাতাই বলে দিলেন।

বলে দিলেন, 'নীলাচলে গিয়ে থাকো।'

নীলাচলে? সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শচীমাতার দিকে।

'হ্যাঁ, নীলাচলে থাকলেই সমস্তার সমাধান হয়।' বললেন শচীমাতা, 'নিমাইকে জন্মস্থানেও থাকতে হয় না আর আমরাও তার সংবাদ পেতে পারি। তোমরাও তার কাছে যেতে পারো নীলাচলে, আর নিমাইও নবদ্বীপে আসতে পারে গঙ্গাস্নানে।' 'নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর। লোক-গতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর॥'

এমন মা না হলে কি এমন পুত্র হয়?

'নিজের দুঃখ গণনার মধ্যেও আনি না', বললেন শচীমাতা, 'যাতে আমার নিমাইয়ের সুখ, তাইতেই আমার একমাত্র আনন্দ।' 'আপনার সুখদুঃখ তাহা নাহি গণি। তাঁর যেই সুখ সেই নিজসুখ মানি।'

সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল।

মায়ের কথাই বেদ-আজ্ঞা, সানন্দে মেনে নিলেন মহাপ্রভু। যাব নীলাচল। থাকব নীলাচল।

'তোমরা এবার তবে বাড়ি ফিরে যাও।' নবদ্বীপবাসীদের সকলকে সম্মান করে বললেন মহাপ্রভু, 'বাড়ি গিয়ে কৃষ্ণসঙ্কীর্তন করো। আমি নীলাচলে যাই। সকলকে বলে যাচ্ছি, মাঝে মাঝে তোমাদের মধ্যে ফিরে আসব, দেখা দিয়ে যাব।'

'ঘর যাঞা কর সদা কৃষ্ণসঙ্কীর্তন।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আমি তোমায় দিব দরশন॥'

হরিদাস এসে কেঁদে পড়ল। বললে, 'তুমি শ্রীক্ষেত্রে গেলে আমার কী গতি হবে? আমার তো সেখানে যাবার অধিকার নেই। আমি যে যবন, আমি যে অস্পৃশ্য। তোমাকে না দেখে আমার এ পাপিষ্ঠ জীবন বাঁচবে কি করে?'

প্রভু বললেন, 'হরিদাস, তোমার দৈন্য সংবরণ করো। তোমার দৈন্য দেখলে অস্থির হয়ে পড়ি। তোমার ভয় নেই, তোমার কথা

জগন্নাথের চরণে নিবেদন করব, তাঁর কৃপায় তোমাকে নিয়ে যাব শ্রীক্ষেত্রে।'

কে এই জগন্নাথ? এই জগতের নাথ?

যিনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ, বাইরে গৌরবর্ণ, যিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের দিয়ে নিজের বৈভব প্রকাশ করেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সঙ্কীর্তন-রূপ অর্চনায় আমরা আশ্রয় করেছি। রাধিকার গৌরকান্তি অঙ্গীকার করেছেন বলেই তিনি গৌর। সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ।

উপপুরাণে ব্যাসকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, 'কোনো কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করে আমি পাপহত মানুষদের হরিভক্তি শিখিয়ে থাকি।'

সকল কলিতে নয়, কোনো এক কলিতে। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-লীলা প্রকটিত করেন, সন্দেহ কী, তারই অব্যবহিত পরবর্তী কলিতে।

তা হলে শাস্ত্রেই বলা আছে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ। ভগবান ছাড়া কার এত বিভূতি গোচরীভূত হয়? কোন মানুষে সম্ভব এত প্রেমবিকার? কার সাধ্য বন্য পশু-পাখিকে প্রেমদানে বশীভূত করবে? সন্দেহ কী, চৈতন্যই পরতত্ত্বের সীমা, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। আর লীলারস আস্বাদনের ভিত্তিই তত্ত্বজ্ঞান বা সিদ্ধান্ত। তর্কে নয় সিদ্ধান্তেই জাগবে সুদৃঢ় নিষ্ঠা। 'চৈতন্য-গোসাঞিব এই তত্ত্ব নিরূপণ। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥'

অদ্বৈত বললে, 'তুমি এখুনি যেও না। দিন দু চার থাকো কৃপা করে।'

দশ দিন থাকলেন মহাপ্রভু।

শচীমাতা বললেন, 'এ কদিন আমি রান্না করব। রান্না করে খাওয়াব আমার নিমাইকে। আর সকলে অন্যত্র কত তো দেখতে পাবে নিমাইকে, কিন্তু আমি আর কোথায় তার দর্শন পাব?'

না, না, তুমিই রান্না করে খাওয়াবে বৈকি। তুমি থাকতে আর কার হাতে খাব? আর কার ব্যঞ্জন সুস্বাদু লাগবে?

শুধু কি নিমাইয়ের জন্যে রান্না ? বহুতর ভক্তই প্রসাদপ্রত্যাশী।

তা হোক, প্রভুর কৃপায় অদ্বৈতের কি অপ্রতুল আছে ? তার ভাণ্ডার অক্ষয়-অব্যয়। যতই ব্যয় করো ততই আবার তা পূর্ণ হয়ে ওঠে। কোত্থেকে আসে, কে জোটায়, তা কে বলবে!

'আনন্দিত হইয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
আচার্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি গৃহ সম্পদ ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভু-আরাধনে॥'

ভোজনতৃপ্ত পুত্রমুখ দেখে শচীর গভীর আনন্দ।

দিনে ভক্তদের নিয়ে কৃষ্ণকথা, আর রাত্রে নর্তন-কীর্তন—এ চলছে নিয়মিত। কৃষ্ণকথায় কেমন শান্ত নিমাই, কিন্তু নর্তনে-কীর্তনে একেবারে উন্মাদ। স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদগদ প্রলয়—এসব তো হচ্ছেই, থেকে থেকে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ছে। শচীমা হাহাকার করে উঠছেন, নিমাইয়ের শরীর বুঝি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করছেন, 'দেখো আমার নিমাইয়ের শরীরে যেন ব্যথা না লাগে। বাছা আমার সন্ন্যাস করেছে বলে কি তার শরীরে ব্যথা লাগে না ?'

ব্যথার মধ্যেই যে আনন্দের বাসা। এ যে বিষামৃতে একত্র মিলন।

যাত্রার দিন উপস্থিত হল।

'হরি বোল।' হুঙ্কার করে উঠলেন মহাপ্রভু। 'হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই। ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই।'

ক্রন্দনের রোল তুলল ভক্তদল।

প্রভু বললেন, 'ঘরে ফিরে যাও সকলে। যা বলেছি, কৃষ্ণকীর্তন করো। আবার আমাদের দেখা হবে। মা-ই তো বলেছেন, তোমরা নীলাদ্রি যাবে আর আমি গঙ্গাস্নান করতে নবদ্বীপে আসব।'

ভক্তের আশ্রমে, ভক্তির আশ্রয়েই আমি সর্বক্ষণ বিরাজ করি।

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় নেই কেউ। যদিও আমার স্বতন্ত্র বিহার, তবু আমি ভক্ত-পরবশ। তোমরাই আমার সর্বস্ব। তোমাদের ছেড়ে আমার তিলার্ধও বিচ্ছেদ নেই।

'ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতামাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ-স্বভাব আমার॥
তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার।
তোমা সবা লাগি মোর সর্ব অবতার॥
তিলার্ধেও আমি তোমা সবারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সভে সত্য জান ইহা॥'

ভগবানের যত লীলা, সমস্তেরই উদ্দেশ্য ভক্ত-চিত্ত-বিনোদন। ভক্ত যেমন ভগবানের সুখ ছাড়া আর কিছু জানে না, ভগবানও তেমনি ভক্তের সুখ ছাড়া আর কিছু জানেন না। প্রেম-রস আস্বাদনের জন্যেই কৃষ্ণের প্রকটলীলা, আর এই আস্বাদনেই তাঁর ভক্তকে অনুগ্রহ। 'এই সব রসনির্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্ব ভক্তেরে প্রসাদ॥' ভক্তকে নিয়েই ভগবান এই জগতের মেলা বসিয়েছেন, ভক্তের হৃদয়েই তাঁর রসের খেলা চলছে, এই অনুভবটিই তাঁর অপার অনুগ্রহ। 'রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম।' ধর্ম মানে বেদধর্ম, লোকধর্ম আর কর্ম মানে যাগযজ্ঞ, বৈদিক অনুষ্ঠান। ধর্মকর্মের উদ্দেশ্য ইহলোকের বা পরলোকের সুখ। এ সুখ অনিত্য। কৃষ্ণসেবাসুখের তুলনায় তুচ্ছ।

তাই কৃষ্ণে নির্মল অনুরাগ করো। ভগবানে পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপ কোরো না। সূর্য সর্বত্র সমানভাবেই রোদ দিচ্ছে। ঘরের মধ্যে শীতার্ত মনে হয়, বাইরে রোদে এসে বোসো। ঘরে বন্দী হয়ে থেকে সূর্যের দোষ ধোরো না। সূর্য-সান্নিধ্যে, কৃষ্ণ-সান্নিধ্যে চলে এস।

ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ দেখাবার জন্যেই ভগবান সর্বচিত্তহারিণী লীলা করছেন। ভক্তের মুখে সেই লীলাকথা শুনবে আর সকলে। শুনে তারা আবার বলবে। তারা আবার ভগবৎপরায়ণ, লীলাকথা-পরায়ণ হবে। ভক্ত নিজে ভগবৎ-লীলার অনুষ্ঠান করবে না—সাধ্য কী সে সমুদ্রোদ্ভব বিষ পান করে—সে শুধু ভগবৎলীলাকথা শুনবে, বলবে, ভাববে অনন্যনিষ্ঠ হয়ে।

শচীমাতাও কি কাঁদছেন ? তিনি তো অনুমতি দিয়েছেন যেতে। তবু অশ্রুধারা বারণ মানছে না। অশ্রুধারার সান্ত্বনা কোথায় ?

মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলেন প্রভু। আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'মা, তুমি উতলা হয়ো না। শুধু কৃষ্ণকে স্মরণ করো। তা হলেই আমাকে পাবে কোলের কাছে।' 'প্রভু বলে মাতা দুঃখ না ভাবহ মনে। সর্বসিদ্ধি হইবেক কৃষ্ণ আরাধনে॥ যদি শ্রদ্ধা আমা প্রতি আছে সবাকার। কৃষ্ণ ভজ তবে সঙ্গ পাইবে আমার॥'

চারজন সঙ্গী নিলেন মহাপ্রভু। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ দত্ত আর দামোদর। কিন্তু পথে পা বাড়িয়েছেন কী, বহু বৈষ্ণব ভক্ত পিছু নিল। আমাদেরও সঙ্গী করো। আমাদের ফেলে যেও না।

'বলেছি তো, ঘরে গিয়ে কৃষ্ণ নাম গান করো।' ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন মহাপ্রভু, 'আমার বিরহে দুঃখ পাবে ভেবেছ ? কেউ দুঃখ পাবে না। কৃষ্ণকীর্তনে ডুবলে কারু দুঃখ থাকে না। তোমাদের তো আমি বৃহৎ সম্পত্তিই দিয়ে গেলাম। আর দেখবে যখনই কৃষ্ণভজন করবে, আমি তোমাদের কোলে বসে আছি।' 'কাহারো হৃদয়ে নাহি রবে দুঃখশোক। সঙ্কীর্তন-সমুদ্রে ডুবিবে সর্বলোক॥ কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচী। যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি॥'

তোমার পথ আর কে নিরোধ করতে পারে বলো। যখন নীলাচলে চিত্ত তোমার স্থির হয়েছে, সাধ্য নেই কেউ তোমাকে নিবৃত্ত করে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন তোমার কিঙ্করের কিঙ্কর। দুর্ঘট সময়

হোক, উড়িষ্যার রাজায় আর বাঙলার নবাবে বিবাদ হোক, তাতে তোমার কী। আমরা ফিরে যাচ্ছি। তুমি সুখে থাকো। তোমার ইচ্ছায়ই সব হচ্ছে। তোমার ইচ্ছারই জয় হোক।

'যে করেন মনে কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়॥
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা বই আর কেহো করিতে না পারে॥'

একমাত্র কৃষ্ণভক্তরাই ভক্তিরস আস্বাদন করতে পারে। যারা অভক্ত, তাদের পক্ষে ও রস-আস্বাদন অসম্ভব। যাদের ভক্তিবিষয়ে আদর নেই, যারা ফল্গুবৈরাগ্য ধারণ করেছে, যারা শুষ্ক জ্ঞানের অভ্যাসে তৎপর, যারা তার্কিক, কর্মকাণ্ডপরায়ণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মসন্ধানী, তারা এ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত। যাদের চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজই যাদের সর্বস্ব, তাদেরই এ রসে অধিকার। নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানও নিরর্থক, যদি তা ভক্তিবর্জিত থাকে। 'কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে। কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥' যারা শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ, তাদের মায়ামুক্তি জ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই হতে পারে। ভক্তি পরমস্বতন্ত্রা। ভক্তিরেব ভূয়সী। ব্রহ্মা তাই কৃষ্ণকে বলছে, মঙ্গলহেতুভূতা ভক্তি ছেড়ে যারা জ্ঞানের জন্যে ক্লেশ স্বীকার করে, তারা অন্তঃসারহীন স্থূল তুষকেই আঘাত করে। অর্থাৎ তাদের ভাগ্যে তণ্ডুল জোটে না, তাদের পরিশ্রমই সার।

বঙ্গদেশের শেষপ্রান্তে সাগরসঙ্গমের কাছে ছত্রভোগের দিকে যাত্রা করলেন মহাপ্রভু। ডায়মণ্ডহারবারের দিকে জয়নগর-মজিলপুরের কাছাকাছি গ্রাম এই ছত্রভোগ। এখানে বিরাজমান অম্বুলিঙ্গ মহাদেব।

৪১

'পথের সম্বল কে কী এনেছ?' নিত্যানন্দকে জিগগেস করলেন প্রভু।

'একটা কানাকড়িও সঙ্গে নিইনি।' বললে নিতাই, 'সম্বলের মধ্যে দণ্ড, করোয়া, কৌপীন ও বহির্বাস। তোমার আদেশ ছাড়া কার সাধ্য আছে জিনিস নেয়!'

কথা শুনে খুশি হলেন গৌররায়। বললেন, 'কেউ যে কিছু সঙ্গে নাওনি, তাতে বড় তৃপ্তি পেলাম। কৃষ্ণ ত্রিজগৎ পালন করেন, আমাদেরও করবেন। তাছাড়া, কৃষ্ণ যদি অন্ন মাপান, অরণ্যেও তা মিলবে। আর যদি না মাপান, রাজপুত্রও থাকবে অনাহারে। সর্বত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাই ফলবতী।'

'ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে-দিনে লিখন।
অরণ্যেও আসি মিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু যারে যেদিনে বা না লিখে আহার।
রাজপুত্র হউ তভো উপবাস তার॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিবে সর্বত্র॥

ছত্রভোগে পৌঁছুবার আগে এলেন আটিসারায়। গ্রাম হলে কী হয়, সেখানে থাকে অনন্ত পণ্ডিত। তার ঘরে প্রভু অতিথি হলেন। কৌপীন বেশ, হাতে দণ্ড কমণ্ডলু, ভিক্ষেয় বেরুলেন। অনুচরদেরও নিলেন সঙ্গে। ভিক্ষাই যে সন্ন্যাসীর ধর্ম, তাই শেখালেন সবাইকে। আর যতক্ষণ গৃহে আছেন ততক্ষণ শুধু কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণকীর্তন।

ছত্রভোগে গঙ্গা শতমুখী। সেখানে জলময় শিবলিঙ্গ। ভগীরথ

যখন গঙ্গাকে নিয়ে এল, তখন বিরহবিহ্বল শিব উপস্থিত হল ছত্রভোগে। গঙ্গাকে দেখেই তার জলে ঝাঁপ দিল। সেখানেই বিরাজ করল জলরূপে।

শাক্ত ও বৈষ্ণবদের তারকতীর্থ ছত্রভোগ। তারপর এখন আবার চৈতন্যচন্দ্রের পদস্পর্শ পড়ল।

শতমুখী গঙ্গা দেখে প্রভুর নয়নধারাও শতমুখী হল। তিনি অম্বুলিঙ্গ-ঘাটে স্নান করলেন। স্নানান্তে যে বহির্বাস পরেন, তাই আবার চোখের জলে ভিজে যায়।

ছত্রভোগ গৌড়রাজ্যের দক্ষিণ সীমা। সে দক্ষিণাংশের অধিকারী রাজা রামচন্দ্র খান। হোসেন শার অধীনস্থ কর্মচারী। ওপারেই উড়িষ্যা, প্রতাপরুদ্র যার রাজা। গৌড়ের সঙ্গে উড়িষ্যার তখন কলহ, সাধ্য নেই সহজে কেউ গৌড় থেকে যেতে পারে উড়িষ্যায়।

দোলায় চড়ে কোথায় যাচ্ছিল রামচন্দ্র। পথে এত কোলাহল কেন? মুখ বাড়িয়েই দেখতে পেল প্রভুকে। দেখল তেজোদৃপ্ত বিশাল পুরুষ। দেখেই কেমন ভয় হল। তাড়াতাড়ি নামল দোলা থেকে। নেমেই পড়ল প্রভুর পদতলে।

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নেই। হা হা জগন্নাথ বলে কাঁদছেন আকুল হয়ে।

রামচন্দ্র খান ফাঁপরে পড়ল। এ আর্তির সম্বরণ হবে কী করে?

'দেখুন আপনার পায়ের কাছে কে পড়ে আছে?' নিতাই প্রভুকে বললে সকাতরে।

'তুমি কে?' গৌরসুন্দর চমকে উঠলেন।

'আমি আপনার দাসানুদাস।'

'ইনি এ এলেকার অধিকারী, নবাবের হয়ে শাসন করছেন।' বললে কেউ-কেউ।

'তা হলে তো ভালো হল।' প্রভু তাকালেন রামের দিকে। 'আমি নীলাচলচন্দ্র দর্শন করতে চলেছি। তুমি পারো কিছু সাহায্য করতে?'

'পারি।' বললে রামচন্দ্র। 'গৌড় আর উড়িষ্যা, দুই রাজার বিষম কলহ চলছে, ত্রিশূল পুঁতে নির্ধারণ করেছে সীমানা। যদি কেউ এ সীমানা লঙ্ঘন করে, তাকে গুপ্তচর মনে করে তক্ষুনি হত্যা করা হয়। কাউকে এ পথে যেতে দিই—আমার অধিকার নেই। যদি উপরে জানতে পারে, তা হলে আমার ফাঁসি হবে। তা হোক, আমার জাতি-প্রাণ-ধন সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, তবু আপনাকে আমি পাঠাবই নীলাচল। আপনার ইচ্ছার আমি অপূরণ হতে দেব না।'

রামচন্দ্রের দিকে শুভদৃষ্টিপাত করলেন প্রভু। দৃষ্টিমাত্র তার সর্ববন্ধনের ক্ষয় হয়ে গেল।

এক ব্রাহ্মণের ঘরে রাত কাটালেন। খেলেন নামমাত্র। কোথায় জগন্নাথ, কতদূর জগন্নাথ—রাত্রে-দিনে এই শুধু কাতরতা। কোথায় নীলাচলচূড়ামণি!

প্রহর খানেক রাত তখনো আছে, রামচন্দ্র এসে বললে, 'নৌকো এনেছি। রাত থাকতেই যাত্রা করুন।'

হরি-হরি বলে ত্বরিতে নৌকোয় উঠলেন গৌরহরি। একে একে অনুচরেরাও উঠল। উঠেই প্রভু নৃত্য করতে সুরু করলেন। মুকুন্দকে বললেন, কীর্তন লাগাও। 'হরিহরয়ে নমঃ' কীর্তন আরম্ভ করল মুকুন্দ।

মাঝিরা বিপদ দেখল। তারা ভেবেছিল গোপনে প্রভুকে উড়িষ্যায় নামিয়ে দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাবে। কিন্তু এ যে দেখছি ভরাডুবি! এভাবে নাচলে নৌকো বেসামাল হয়ে যাবে তলিয়ে। তাছাড়া কোলাহলে জলদস্যুরা আকৃষ্ট হবে। ধন-প্রাণ কিছুই বাঁচবে না।

তখন তারা প্রভুর কাছে মিনতি করল: 'নাচের উৎপাতে নৌকো ডুবে গেলে কোথায় যাব, কোথায় পৌঁছিয়ে দেব? জল-ডাকাতরা ঘুরছে আশে-পাশে। গোলমাল শুনলেই সদলবলে চলে আসবে।

আমাদের দেখছি, ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির। নীরবে বসুন শান্ত হয়ে। আমাদের বাইতে দিন চুপচাপ।'

প্রভুর সঙ্গীরা সঙ্কুচিত হল। যা বলছে মাঝিরা তা অযৌক্তিক নয়।

প্রভু হুঙ্কার করে উঠলেন: 'তোমরা ভয় পাচ্ছ? ভয় কী! এই দেখ সুদর্শন চক্র। ঘুরে ঘুরে ভক্তদের সর্ববিঘ্ন খণ্ডন করছে। কিছু চিন্তা কোরো না, কীর্তন লাগাও! তোমরা দেখ কি না-দেখ, সুদর্শন ফিরছে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে।'

'ব্যপদেশে মহাপ্রভু কহেন সভারে।
নিরবধি সুদর্শন ভক্তরক্ষা করে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন-অগ্নিতে সে পাপী পুড়ে মরে॥
বিষ্ণুচক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে ভক্তজনেরে লঙ্ঘিতে॥'

প্রিয়বর্গ আবার কীর্তন ধরল। মাঝিরাও আশ্বস্ত হয়ে বাইতে লাগল নৌকো।

দিন কয়েক পরে উড়িষ্যায় বালেশ্বরের কাছে প্রয়াগঘাটে নৌকো থামল।

'কারে বোলে রাত্রি দিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল কিবা স্থল পার বা ওপার॥
কিছুই না জানে প্রভু ডুবি ভক্তিরসে।
প্রিয়বর্গ রাখে নিরবধি রহি পাশে॥'

প্রয়াগঘাটে প্রভু স্বগণদের নিয়ে স্নান করলেন। সেখানে যুধিষ্ঠিরের প্রতিষ্ঠিত মহেশ আছে, তাকে প্রণাম করলেন। ভক্তদের বললেন, 'তোমরা বোসো, আমি ভিক্ষে মেগে আনি।'

সে কী! তুমি যাবে কোথায়? ভক্তদল আপত্তি করল। আমরা কেউ যাই।

কারু আপত্তি শুনলেন না প্রভু। নিজেই বেরুলেন একা-একা। বহির্বাসকে ঝুলির মত করে ধরলেন।

লক্ষ্মী যাঁর পাদপদ্মে স্থানভিক্ষা করছে, তিনিই কিনা পথের ভিখিরি! 'হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে। ন্যাসী রূপে ভিক্ষা-ছলে জীব ধন্য করে॥'

ওরে ছাখ, পথে কে এক নতুন সন্নেসী বেরিয়েছে। আহা, মরে যাই, কী সুন্দর দেখতে! ভিড় জুটে গেল চারপাশে। যার ঘরের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ান, সেই বিহ্বল হয়ে তাকায়, মনে হয়, এ সোনার বিগ্রহকে যথাসর্বস্ব দিয়ে দিই।

ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ফিরলেন গৌরহরি। মন্দিরে ভক্তরা অপেক্ষা করছিল, সেই মন্দিরে। ঝুলি তো নয়, এক সাম্রাজ্য নিয়ে ফিরেছেন! ভক্তরা তো অবাক। 'পারবে, তুমি পারবে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে। তুমিই আমাদের দেহের অন্ন, আত্মার পরমান্ন।'

আহারান্তে সুরু হল কীর্তন। সমস্ত গ্রাম ধন্য ধন্য করে উঠল।

উষাকালে আবার যাত্রা করলেন প্রভু।

কিন্তু এবার ঘাটের পাটনি পথ আটকাল। বললে, 'দান দাও, নইলে পার করব না।'

যিনি ভবসাগর পার করবেন—তাঁরই পথরোধ।

ভক্তরা বললে, 'কোত্থেকে দান দেব, আমাদের কপর্দক মাত্র নেই।'

'তা হলে ওদিকে গিয়ে বসো, এদিকে এস না।' পাটনি অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিল।

কিন্তু সহসা প্রভুর চোখের উপর চোখ পড়ল পাটনির! কী হল কে জানে, পাটনি প্রভুকে লক্ষ্য করে বললে, 'আচ্ছা, তুমি এস। আর ওরা,' ভক্তদের নির্দেশ করল পাটনি, 'ওরা কি তোমার লোক?'

প্রভু বললেন, 'এ জগতে আমার কেউ নেই, আমিও কারু নই। আমি একান্তই একা।'

'তা হলে তুমি এদিকে এস, একা শুধু তোমাকেই পার করব।'

প্রভু ভক্তদের ছেড়ে ঘাটের কাছে গিয়ে বসলেন।

ভক্তরা প্রমাদ গুনল, প্রভু কি তবে আমাদের ছেড়ে দিয়ে একাই নীলাচল যাবেন? প্রভু ছাড়া আমরা তবে বাঁচব কী করে?

নিত্যানন্দ বললে, 'ভয় নেই। প্রভু কি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারেন?'

'তোমরা তো গোঁসাইয়ের কেউ নও', পাটনি ভক্তদের কাছে হাত পাতল: 'তবে ঘাটের কড়ি বের করো।'

সকলে ত্রস্ত হয়ে উঠল, কে যেন উচ্চরোলে কাঁদছে। কাঁদছে আর বলছে, জগন্নাথ, তুমি কতদূরে? দেখা দাও, দেখা দাও আমাকে।

পাটনি স্তম্ভিত হয়ে গেল। কাঠ-পাথর গলে যায়, এমন কান্নাও কাঁদা যায় নাকি? ভক্তদের জিগগেস করলে, 'এমন অদ্ভুত কাঁদছেন ইনি কে?'

'ইনি আমাদের ঠাকুর। সকলের ঠাকুর।' অশ্রুচোখে বললে ভক্তদল।

'কে ঠাকুর?'

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম শুনেছ? ইনি সেই নবদ্বীপের অবতার, ত্রিজগতের ঈশ্বর। সন্ন্যাসীবেশে জীবোদ্ধার করবেন বলে চলেছেন নীলাচল।'

পাটনি প্রভুর পায়ে গিয়ে পড়ল।

সর্বজীবনাথ হরি-হরি বলে উঠলেন। নৌকো চলল পরপার।

পৌঁছুলেন রেমুণায়। পরমমোহন গোপীনাথকে দর্শন করলেন। প্রণাম করতেই গোপীনাথের পুষ্পচূড়া প্রভুর মাথার উপর খসে পড়ল। তা মাথায় বেঁধে প্রভু নৃত্য করতে লাগলেন। গোপীনাথের

সেবকেরা অবাক মানল। এত রূপ তারা কোনোদিন দেখেনি, এত প্রেম। কে গোপীনাথ। যে মন্দিরে স্থির, না, যে অঙ্গনে নৃত্যপর?

'এই যে ঠাকুর ইনি একদিন ভক্তের জন্য ক্ষীর চুরি করেছিলেন,' সমবেত সকলকে বলছেন প্রভু, 'তাই এঁর নাম ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।'

'কে সে ভক্ত?'

'মাধবেন্দ্র পুরী।'

বৃন্দাবনে তাঁর গোপালের গায়ে চন্দন মাখাবার স্বপ্নাদেশ হয়েছে, সেই চন্দনের সন্ধানে নীলাচলে যাচ্ছিলেন মাধবেন্দ্র, পথিমধ্যে থেমেছেন রেমুণায়, গোপীনাথকে দেখতে। গোপীনাথের বারোখানি ক্ষীর ভোগ হয়, বারো থালায় সাজিয়ে। সেই ক্ষীরের স্বাদ অমৃতের তুল্য বলে তার নাম অমৃতকেলি। মাধবেন্দ্র কোনোদিন কারু কাছে কিছু চেয়ে আহার করত না, কিন্তু সেদিন গোপীনাথের ক্ষীর খেতে তার আকাঙ্ক্ষা হল। আকাঙ্ক্ষা হতেই লজ্জায় মরে গেল মাধবেন্দ্র, এই আকাঙ্ক্ষায় তার অযাচক বৃত্তির হানি ঘটেছে। অপরাধ-মোচনের জন্যে বিষ্ণু স্মরণ করতে লাগল। কিন্তু গোপীনাথ করল কী? গোপীনাথ মাধবেন্দ্রের জন্যে ক্ষীর চুরি করল, লুকিয়ে রেখে দিল ধড়ার আড়ালে। রাত্রে পূজারীকে স্বপ্ন দেখাল, ভোগের জায়গায় বারোখানা ক্ষীরের জায়গায় যে এগারোখানা ছিল লক্ষ্য করোনি। বাকি একখানি আমি আমার ভক্ত মাধবেন্দ্রের জন্য চুরি করে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি। যাও, সেই ক্ষীরখানি মাধবেন্দ্রকে দিয়ে এস। মাধবেন্দ্র হাটের আটচালার নিচে শুয়ে আছে।

'ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণ।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবন॥'

ভক্তের জন্যে ভগবান চুরি পর্যন্ত করতে প্রস্তুত। ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্যের স্বীকৃতিতে গোপীনাথের নাম "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।"

মাধবেন্দ্রের অমৃত চরিত ভক্তদের কাছে বর্ণন করলেন মহাপ্রভু। গোপালের জন্যে চন্দনভার বয়ে নিয়ে চলেছে, কোনো কষ্টকেই অন্তরায় বলে মানছে না। প্রগাঢ় প্রেমের এমনি স্বভাব যে প্রিয়-সুখের জন্যে প্রেমিক সমস্ত দুঃখকে তুচ্ছ করতে পারে, সমস্ত বিঘ্নকে তুচ্ছতর। 'প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার। নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার॥' তারপর চন্দনভার নিয়ে যখন রেমুণায় এল, তখন গোপাল বললে, তোমাকে এ বোঝা বৃন্দাবনে বয়ে আনতে হবে না, তুমি গোপীনাথকেই চন্দন মাখাও, তাতেই আমি সুশীতল হব। ভক্তশ্রম লাঘব করে দিল গোপাল।

সেই মাধবেন্দ্র—পরম নিস্পৃহ, বৃথালাপবর্জিত, সর্বত্র উদাসীন, গ্রাম্যবার্তার ভয়ে দ্বিতীয়সঙ্গহীন, প্রতিষ্ঠা বা সুখ্যাতির ভয়ে চিরকাতর —যখন দেহ রাখছেন তখন দিব্যোন্মাদগ্রস্তা রাধিকার মত বিলাপ করছেন : হে দীনদয়ার্দ্র কৃষ্ণ, দেখা দাও, তোমার অদর্শনে প্রাণ যায়, তুমি দেখা না দিলে আমি কী করব, কী করতে পারি বলো।

মহাপ্রভু সেই শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তাঁরও মধ্যে দেখা দিল রাধিকার প্রেমোন্মাদ।

রেমুণা থেকে প্রভু এলেন যাজপুর। যাজপুরে বৈতরণী নদীতে স্নান করলেন, বরাহঠাকুরকে দর্শন করলেন, পীঠাধিষ্ঠাত্রী বিরজা দেবী ও ত্রিলোচনেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে গিয়েও প্রণাম করলেন। বিরজা দেবীকে দেখে তাঁর গোপীভাব উপস্থিত হল। বদ্ধাঞ্জলি হয়ে ভিক্ষে করলেন কৃষ্ণপ্রেম।

তারপর চলে এলেন কটক। প্রতাপরুদ্রের বাসস্থান, উড়িষ্যার রাজধানী এলেন সাক্ষীগোপাল দেখতে।

সাক্ষীগোপালের কাহিনীটি প্রভুকে শোনালে নিত্যানন্দ।

বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ তীর্থ করতে গিয়েছে বৃন্দাবন। একজন

বুড়ো, আরেকজন যুবক। যুবক সারাক্ষণ বৃদ্ধের সেবাযত্ন করছে। বৃদ্ধ খুশি হয়ে বললে, তোমাকে সম্মান না করলে আমার কৃতঘ্নতা হবে। অতএব আমি তোমাকে কন্যাদান করব।

যুবক বললে, 'এ অসম্ভব। আমি অকুলীন, উপরন্তু দরিদ্র, বিদ্যার্জনও বেশি করিনি, সুতরাং এ প্রস্তাব ফিরিয়ে নিন। আপনার সেবায় কৃষ্ণ খুশি হবেন—সেই আশায় আপনার পরিচর্যা করছি। পাত্র হবার মত আমার যোগ্যতা নেই।'

বৃদ্ধ মানল না। বললে, 'তুমি সংশয় কোরো না। আমি নিশ্চয় করে বলছি, তোমাকেই কন্যা সমর্পণ করব।'

যুবক আবার বাধা দিল। বললে, 'আপনার অনেক জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, তাদের সম্মতি ছাড়া এ প্রস্তাব অর্থহীন।'

বৃদ্ধ বললে, 'কন্যা আমার আপন বিত্ত, তা দিতে অন্যের নিষেধ চলবে কেন? যদি জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কেউ বাধা দিতে আসে, তাদেরকে নিরস্ত করে বা বর্জন করে আমি কথা রাখব।'

'তা হলে গোপালকে সাক্ষী রাখুন।'

গোপালকে সাক্ষী রাখল বৃদ্ধ। গোপালের সাক্ষাতে বললে, 'আমি আমার নিজধন নিজকন্যা এই যুবককে দান করব।'

'তুমি আমার সাক্ষী।' গোপালকে বললে যুবক, 'যদি অন্যথাচরণ দেখি, তোমাকে ডাকব সাক্ষ্য দিতে।'

গুরুবুদ্ধিতে বৃদ্ধকে যুবক সেবা করতে লাগল প্রাণপণে। দেশে ফিরে এসে বৃদ্ধ সমস্ত বৃত্তান্ত আত্মীয় বন্ধুদের কাছে বিবৃত করলে। সকলে হাহাকার করে উঠল, নীচ বংশে কন্যা দেবে—অমন হীন কথা মুখেও এনো না। সমস্ত সমাজ উপহাস করবে আমাদের।

'কিন্তু তীর্থবাক্যের অন্যথা করি কী করে?' বৃদ্ধ বললে সকাতরে।

আত্মীয়-বন্ধুরা রুখে দাঁড়াল। বললে, তা হলে আমরা সকলে তোমাকে ত্যাগ করব। স্ত্রী-পুত্র বললে, বিষ খাব।

'ও যে তা হলে গোপালকে সাক্ষী ডাকবে।' বৃদ্ধ বললে, 'লাভের মধ্যে মামলাতে ও জিতবেই, আমাকে ধর্মভ্রষ্ট হতে হবে। এ সহ্য হবে না।'

'কিসের তোমার সাক্ষী?' পুত্র বললে রুষ্ট হয়ে, 'একটা নিশ্চল বিগ্রহ, তাও দূর দেশে রয়েছে। সে আসবে সাক্ষ্য দিতে!' পরে বললে নিভৃত হয়ে, 'যুবক যদি এসে কন্যা দাবি করে, আর তুমি সরাসরি মিথ্যে বলতে না পারো, বোলো, কী বলেছি আমার স্মরণ নেই। তা হলেই ওর মামলা টেঁসে যাবে।'

'তা আমি কী করে বলতে পারি? কথা দিইনি—এ যেমন মিথ্যে, স্মরণ নেই—এ আরো মিথ্যে। গোপাল, আমার দু-দিক রক্ষা করো।' গোপালচরণে বৃদ্ধ কাঁদতে লাগল। 'দেখো আমার ধর্মও যেন বাঁচে, আত্মীয়স্বজনও না রুষ্ট হয়।'

একদিন সত্যি-সত্যিই যুবক এসে দাবি জানাল। অঙ্গীকার রাখতে চেষ্টা করছেন না, এ আপনার কেমনতরো আচরণ?

বৃদ্ধ চুপ করে রইল। কিন্তু তার পুত্র এল ঠেঙা নিয়ে। তুমি বামন হয়ে চাঁদ চাইছ? কুলহীন অধম হয়ে চাইছ আমার বোনকে বিয়ে করতে?

যুবক পালিয়ে গেল প্রাণভয়ে। গ্রামস্থ পঞ্চজনের কাছে শরণ নিল। সালিশ বসল গণ্যমান্যদের। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তলব হল। বলো, কেন একে কন্যা দিচ্ছ না? কথা দিয়েছ তো কথার খেলাপ করছ কেন?

ছেলে যা শিখিয়ে দিয়েছিল তাই বললে বৃদ্ধ। বললে, 'কখন কী বলেছি আমার কিছু স্মরণ নেই।'

তখন ছেলে অগ্রবর্তী হয়ে বললে, 'শুনুন। তীর্থযাত্রায় বাবার সঙ্গে অনেক টাকাকড়ি ছিল। ঐ পাষণ্ড বাবাকে ধুতুরা খাইয়ে অজ্ঞান করিয়ে সমস্ত লুট করে নিয়েছে। এখন রব তুলেছে, কন্যাদানের অঙ্গীকার করেছে ব্রাহ্মণ। আপনারাই বিচার করে

বলুন ঐ নরাধম কি পাত্র হবার যোগ্য? ঐ কুলহীন অনাচারী? ওকে বাবা কন্যা দিতে স্বীকার করবেন?'

'কিন্তু সাক্ষী আছে, আমার একজন সাক্ষী আছে।' যুবক চিৎকার করে উঠল।

'কে সাক্ষী?'

'এক মহাজন আমার সাক্ষী।'

'কে, তার নাম কী?'

'তার নাম গোপাল। বৃন্দাবনের গোপাল। সেই পরাবরেশ পরিপূর্ণ পুরুষ। যার বাক্য সত্য বলে ত্রিভুবন মানছে। যার কাছে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ স্বমুখে দিয়েছে প্রতিশ্রুতি।'

'তাই ভালো। গোপাল যদি এসে সাক্ষ্য দেয়,' বৃদ্ধ বললে, 'তবে নিশ্চয় কন্যার্পণ করব।'

'হ্যাঁ, গোপাল যদি এসে বলে –' ব্রাহ্মণের পুত্র সায় দিল।

বৃদ্ধের আশা—কৃষ্ণ নিশ্চয়ই দয়া করবেন, আমার বাক্য সপ্রমাণ করবেন; আর পুত্রের আশ্বাস, প্রতিমা কখনো আসতে পারে? কখনো হাঁটতে পারে?

যুবক তখন সটান হাজির হল বৃন্দাবনে। গোপালকে গিয়ে বললে, 'গোপাল, দুই বিপ্রের ধর্ম রাখো। কন্যা পাব—এতে আমার গৌরব নেই, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা থাকে—এতেই আমার গৌরব।'

কৃষ্ণ বললে, 'তুমি ফিরে যাও, আমি সভাস্থলে আবির্ভূত হয়ে ঠিক সাক্ষ্য দেব। কিন্তু প্রতিমাস্বরূপে আমি সেখানে যাব কী করে?'

'না, না, তুমি যদি চতুর্ভুজ মূর্তিতে আবির্ভূত হও কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে না। তুমি যে মূর্তিতে আছ সেই মূর্তিতে যাবে আমার সঙ্গে।' বললে যুবক, 'তা হলেই সকলে তোমাকে মান্য করবে।'

'বা, প্রতিমা হাঁটবে কী করে?' বললে কৃষ্ণ।

'তা হলে এখন কথা কইছ কী করে?' বললে যুবক, 'তুমি প্রতিমা নও, তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। ভক্তের জন্যে তুমিই তো অকার্যকরণ করবে। মন্দির ত্যাগ করে আমার সঙ্গে যাবে, যাবে পায়ে হেঁটে, যেমন আমি যাব। যে ভাবে ভজন করব তোমাকে, তুমিও সেইভাবে আমাকে কৃপা করবে।'

'বেশ, আমি যাব তোমার পিছু-পিছু।' গোপাল রাজি হল, 'কিন্তু তুমি সন্দেহবশে পিছন ফিরে তাকাবে না আমি সত্যি যাচ্ছি কিনা। বিশ্বাস করবে। যদি ফিরে তাকাও আমি তবে সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়ব।'

'বুঝব কী করে যে তুমি ঠিক অনুসরণ করছ আমাকে?'

'আমার নূপুরধ্বনি শুনতে পাবে।'

যুবক গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করল। পিছনে শুনতে পেল নূপুরধ্বনি। তবে গোপালও চলেছে সঙ্গে-সঙ্গে।

চলতে চলতে বহুদিন পরে পৌঁচেছে গ্রামপ্রান্তে। এবার গ্রামে ঢুকব, বাড়ি যাব, সকলকে বলব সাক্ষী আনার কথা, কিন্তু সাক্ষীকে নিজে একবার স্বচক্ষে দেখব না? আমার কেমন সাক্ষী একবার সনাক্ত করব না? এই ভেবে যুবক তাকাল পিছন ফিরে। আর নূপুরধ্বনি নেই। গোপালও থেমে পড়েছে।

যুবক কাঁদতে লাগল।

গোপাল বললে, 'আমি আর অগ্রসর হব না। তুমি বাড়ি যাও, সকলকে ডেকে নিয়ে এস। আমি এখানে দাঁড়িয়েই সাক্ষ্য দেব।'

গ্রামে টি-টি পড়ে গেল। প্রতিমা হেঁটে চলে এসেছে সাক্ষ্য দিতে। হ্যাঁ, সেই মূর্তি। ত্রিভঙ্গবঙ্কিম মুরলীধর। জলজ-লোচন। পীতধড়া ও মোহনচূড়ায় সাজানো। সর্বানন্দকদম্বস্বরূপ।

গোপাল সাক্ষ্য দিল। যুবককে কন্যাদান করল বৃদ্ধ। সর্ব আপত্তির মীমাংসা হয়ে গেল।

বিপ্রদ্বয়কে বর দিতে চাইল গোপাল।

'আর কিছু চাই না আমরা। তুমি শুধু এইখানে থাকো অনন্ত সাক্ষী হয়ে।'

নিত্যানন্দের কাছে গোপালকথা শুনে বিহ্বল হলেন প্রভু। সাক্ষাৎ করতে গেলেন। ভক্তদল তাকিয়ে দেখল, গৌরাঙ্গ আর সাক্ষীগোপাল দুজনেরই একমূর্তি।

'দোঁহে একবর্ণ—দোঁহে প্রকাণ্ড শরীর।
দোঁহে রক্তাম্বর—দোঁহার স্বভাব গম্ভীর॥
মহাতেজোময় দোঁহে কমলনয়ন।
দোঁহার ভাবাবেশমন চন্দ্রবদন॥'

শ্রীচৈতন্যের রূপ কেমন? তপ্তহেম সমকান্তি, প্রকাণ্ড শরীর। কণ্ঠস্বর নবীন মেঘধ্বনির চেয়েও গম্ভীর। দৈর্ঘ্যে নিজের হাতের মাপে চার হাত। দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ালে বিস্তারেও সেই চার হাত। বাহু আজানুলম্বিত, অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত ঝুলিয়ে রাখলে হাতের আঙুলের অগ্রভাগ হাঁটুকে স্পর্শ করে। নয়ন কমলসদৃশ, তিলফুলের চেয়েও সুন্দর নাক, মুখ চন্দ্রের চেয়েও মনোহর।

দেখা গেল সাক্ষীগোপাল সেই চৈতন্যমূর্তি গ্রহণ করেছে।

'ভক্তি তিন প্রকার।' কপিল তার মা দেবহূতিকে বলছে: 'তামস, রাজস আর সাত্ত্বিক। হিংসা, দম্ভ বা মাৎসর্যভরে ক্রোধী পুরুষ যে ভক্তি করে তা তামস ভক্তি। বিষয় যশ কিংবা ঐশ্বর্য কামনা করে যে-ভক্তি তা রাজস ভক্তি। পাপক্ষয়মানসে বা ভগবানের প্রীতিসম্পাদন-আকাঙ্ক্ষায় বা ভগবানে কর্মফল সমর্পণ করবার উদ্দেশ্যে যে ভক্তি তা সাত্ত্বিক। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি নির্গুণা ভক্তি। গঙ্গাধারা যেমন সাগরে গিয়ে মেশে তেমনি যে মনোগতি ফলানুসন্ধান না করে পুরুষোত্তমে নিহিত হয় সেই মনোগতিরূপা ভক্তিই নির্গুণা ভক্তি। যে নির্গুণা ভক্তির অভিলাষী সে ভগবানে একাত্মতাও কামনা করে না। সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য

সাজুয্যও না। ভগবানকে সেবা করবে এর বেশি কিছু তার কামনীয় নয়। একেই বলে ভক্তি অনিমিত্তা, ভক্তি আত্যন্তিকী।'

'চিত্তশুদ্ধির জন্যে কী করতে হবে? কী ভগবানের আদেশ?'

'ফলকামনা না করে নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্মানুষ্ঠান করবে। প্রতিমাকে দর্শন স্পর্শন স্তব বন্দন করবে। সকল প্রাণীতে চিন্তা করবে ভগবদ্ভাব। মহতে সম্মান, দীনে দয়া, আত্মসদৃশ ব্যক্তিতে মিত্রতা, বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, ভগবানের নামকীর্তন ও সরলতাচরণ করবে। সতের সঙ্গ করবে আর নিরহঙ্কার থাকবে। গন্ধ যেমন বায়ুযোগে ঘ্রাণকে আশ্রয় করে তেমনি অবিকারীচিত্ত ভক্তিযোগে পরমাত্মাতে আশ্রিত হবে। ভগবানই সর্বভূতের আবাস, সর্বলোকের সাক্ষী।'

৪২

তারপর এলেন ভুবনেশ্বর। যার আরেক নাম গুপ্তকাশী।

স্নান করলেন বিন্দুসরোবরে। যার আরেক নাম শিবপ্রিয়-সরোবর। সমস্ত তীর্থ থেকে বিন্দু বিন্দু জল এনে যে সরোবর শিব নিজে সৃষ্টি করেছে।

মন্দিরে বিগ্রহের সামনে নাচতে লাগলেন মহাপ্রভু। মত্ত হলেন শিবপ্রেমে। 'শিবপ্রিয় বড় কৃষ্ণ, তাহা বুঝাইতে। নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের অগ্রেতে॥' ভক্তদের নিয়ে করলেন শিবপুজো। যত দেবালয় আছে সে গ্রামে সব দেখলেন ঘুরে ঘুরে।

শিবের কাছে ক্ষমা পেয়ে দক্ষ আবার যজ্ঞ আরম্ভ করলে ঋত্বিকেরা বিষ্ণুকে স্তব করতে লাগল: হে আশ্রয়প্রদ, এই সংসারপথ অতি দুর্গম। পথিকেরা কবে আপনার চরণনিবাস প্রাপ্ত হবে? অহঙ্কারাস্পদ

শরীর ও মমতাস্পদ গৃহই এদের গুরুতর ভার। এখানে মৃত্যুরূপ কালসাপ, বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণা, সুখদুঃখদ্বন্দ্বরূপ বহুতর গর্ত, শোকরূপ দাবাগ্নি পীড়ন করছে। একমাত্র যার চিত্ত আপনার চরণে নিবিষ্ট তারই অমোঘ শান্তি।'

সেখান থেকে কমলপুর।

এখান থেকে জগন্নাথমন্দিরের ধ্বজা দেখা গেল। প্রভু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: 'দেখ দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে বালগোপাল বসে আছেন। স্মিত-সুবদন হাসছেন আমাকে দেখে।'

বিবশ হয়ে লুণ্ঠিত হলেন ভূতলে। কাঁদতে লাগলেন। সে আর্তি অনন্ত জিহ্বায়ও বুঝি বর্ণনা করা যায় না।

ভার্গী নদীতে স্নান করলেন। হাতের দণ্ড নিতাইয়ের কাছে জিম্মা দিয়ে গেলেন কপোতেশ্বরকে দেখতে।

নিতাই সেই দণ্ড তিন-টুকরো করে জলে ভাসিয়ে দিল।

দণ্ডকে বললে, আমি যাকে হৃদয়ে বহন করছি, সে তোমাকে বয়ে বেড়াবে, এ অসহ্য। যাঁর ভুজযুগলই দুই হেমদণ্ড, তিনি আবার একটা বংশদণ্ড বইবেন কেন?

দণ্ড অস্ত্র ছাড়া আর কী! প্রেমসিন্ধু প্রভু কাকে দণ্ড দেবেন, কার শাসক হবেন? নাম-প্রেমে সকলের চিত্তশুদ্ধি ঘটাবার জন্যেই তাঁর আবির্ভাব, তাঁর দণ্ডের কী প্রয়োজন?

সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডী। বাক্য, দেহ আর চিত্ত—এই তিনকে যে দণ্ড দিয়ে শাসন করে বশীভূত করেছে, সেই যতি, ত্রিদণ্ডী। মৌন হচ্ছে বাক্যের দণ্ড, কাম্যকর্মত্যাগ দেহের দণ্ড আর প্রাণায়ামই চিত্তের দণ্ড। দণ্ড স্মারকচিহ্ন। সর্বদা সন্ন্যাসীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তুমি কায়মনোবাককে সংযত করেছ, তুমি নিজেই নিজের দণ্ডদাতা। দৃষ্টিপূত পদন্যাস করবে, বস্ত্রপূত জল পান করবে, সত্যপূত বাক্য বলবে ও মনঃপূত আচরণ করবে।

প্রভুর কী দরকার এই স্মরণচিহ্নে? যিনি মায়াতীত সচ্চিদানন্দ-

নয়, তাঁর আবার কিসের দণ্ড, কাকে দণ্ড? পড়ুয়া নিন্দুকদের অসুরত্ব দূর করবার জন্যেই তাঁর সন্ন্যাস। আর সে অসুরত্ব দূর হবে দণ্ডে নয়, ক্ষমায়। চিত্তের শোধন হবে শুধু কৃপাবর্ষণে। তাই যিনি কৃপা ঢালবেন মুক্তহস্তে, তিনি বদ্ধমুষ্টি হবেন কী করে, কী করে দণ্ড ধরবেন? দণ্ড নিরর্থক।

মূর্তিমন্ত গৌরকৃপা নিতাই তাই ভেঙে ফেলল দণ্ড। দণ্ড তিন বলে টুকরোও তিন করল। ভাসিয়ে দিল নদীতে।

যিনি আগে বংশী হাতে করে তিন জগৎ মোহিত করতেন, তাঁর হাতে এখন তিন-পর্বের বংশদণ্ড। বংশীর বদলে বংশ! অসম্ভব। সুতরাং হে দণ্ড, তোমার দণ্ড নাও, ত্রি-ভঙ্গ হয়ে ভেসে যাও নদীস্রোতে।

সেই থেকে ভার্গীনদীর নাম দণ্ডভাঙা নদী।

আরো কি এক গূঢ় কারণ আছে দণ্ডভঙ্গের?

কপোতেশ্বর শিবকে দর্শন করে ভক্তসঙ্গে প্রভু চললেন শ্রীক্ষেত্রের দিকে। তিনক্রোশ পথ, মনে হচ্ছে যেন সহস্র যোজন। সোনার অঙ্গ কখনো ধুলোয় ধূসর হচ্ছে, কখনো বা চোখের জলে ধুলো ধুয়ে গিয়ে ফুটে উঠছে গৌরকান্তি। শরীরে কোনো অস্থি আছে বলে মনে হচ্ছে না। পথে যে দেখে, সেই বলে এ কে নওলকিশোর! কিশোর নারায়ণ!

প্রেমাবেশে পথ চলেছেন, আঠারনালায় এসে বাহ্যজ্ঞানের প্রকাশ হল। নিতাইয়ের দিকে হাত বাড়ালেন প্রভু। বললেন, 'আমার দণ্ড দাও।'

নিতাই চুপ করে রইল।

'সে কি, আমার দণ্ড কোথায়?' প্রভু কি ঈষৎ রুষ্ট হলেন?

'সে দণ্ড ভেঙে গিয়েছে। তিনখণ্ড হয়ে গিয়েছে।'

'সে কি! কী করে ভাঙল?'

'প্রেমাবেশে ভেঙে গিয়েছে।' গাঢ়স্বর নিতাইয়ের। 'তোমার

আবেশ হলে আমি তোমাকে ধরলুম। জড়াজড়ি করে পড়লুম একসঙ্গে—সেই দণ্ডের উপর। আর দুজনের দণ্ড তিন-টুকরো হয়ে গেল। টুকরোগুলো যে কোথায় গেল, কিছুই জানি না।'

তা হলে দণ্ড কি নিতাই স্বহস্তে স্বেচ্ছায় ভাঙেনি? সে কি মিথ্যে কথা বলছে?

আসলে প্রেমাবেশই দণ্ডভঙ্গের মুখ্য কারণ। নিতাই উপলক্ষ্য মাত্র। যার প্রেমাবেশ হয়েছে তার আবার দণ্ড কিসের? প্রেমাবেশেই ভেসে যাবে দণ্ড। দণ্ডের কথা যে এতক্ষণ ভুলে ছিলেন প্রভু, তার মূলেও সেই প্রেমাবেশ। প্রেমাবেশের কাছে দণ্ড অনাবশ্যক। আর যা অনাবশ্যক, তা থাকলেও যা, ভাঙলেও তা। কেন তবে নিষ্ফল ভারবহন?

আর, তাকিয়ে দেখ, নিমাইয়ে নিতাইয়ে জড়াজড়ি। নিমাইয়ের উচ্ছ্বাসে নিতাইয়ের উত্তম, নিমাইয়ের আবেশেই নিতাইয়ের আবেগ — দণ্ড আর দাঁড়ায় কোথায়?

প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, 'নীলাচলে এনে তোমরা আমার খুব হিত করলে! আর সব গেছে, মাত্র দণ্ডধন ছিল, তাও কেড়ে নিলে, ভেঙে ফেললে। যাও, তোমাদের সঙ্গে আর আমি যাব না। জগন্নাথ দর্শনে হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাই।'

পুরীর কাছাকাছি নদীর উপর যে পোল আছে, তার নামই আঠারনালা। নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথের মন্দির আর দূরে নয়। কিন্তু প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছেন, একাকী যাবেন, হয় আগে নয় পরে।

মুকুন্দ দত্ত বললে, 'প্রভু, তুমিই আগে যাও, আমরা সকলে পরে যাব।'

এইটুকুই বুঝি রহস্য। একা না গেলে বুঝি সার্বভৌম উদ্ধার হয় না।

প্রভুর ইচ্ছাতেই দণ্ড ভাঙল, তা হলে প্রভুর ক্রোধ কেন?

জীবশিক্ষার জন্যেই এই ক্রোধ। প্রাকৃতজন যেন সন্ন্যাসাশ্রমে থেকে দণ্ড না ভাঙে। নিয়ম না অমান্য করে।

ক্রোধ উপলক্ষ্য করে ভক্তদের পিছনে রেখে প্রভু ছুটলেন তীরবেগে। ছুটলেন মন্দিরের দিকে। 'মত্ত সিংহগতি জিনি চলিলা সত্বর। প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর॥' কে তাঁকে রোধ করে! একেবারে জগন্নাথের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ইচ্ছে হল জগন্নাথকে আলিঙ্গন করি। হৃদয়ের মধ্যে নিবিড় করে ধরে রাখি।

ধর ধর মার মার—মন্দিরের প্রহরীরা কোলাহল করে উঠল।

প্রেমাবেশে প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

'সরে দাঁড়াও। মেরো না।' কে গর্জন করে উঠল সহসা।

প্রহরীরা নিরস্ত হল। এ যে সার্বভৌম বারণ করছে। রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত শুধু নয়, একাধারে গুরু, মন্ত্রী, মীমাংসক। তার কথা না শোনা অর্থ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা।

নাম বাসুদেব, উপাধি সার্বভৌম। নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র, সর্বশাস্ত্রে, বিশেষ করে ন্যায়ে ও বেদান্তে সুপণ্ডিত। লোকে বলে, বাঙলা দেশে ন্যায়শাস্ত্র ছিল না, বাসুদেব পড়তে গিয়েছিল মিথিলায়। পাঠশেষে ইচ্ছে হল ন্যায়শাস্ত্র নকল করে দেশে নিয়ে আসে। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক তাতে বাধা দেয়। ন্যায় মিথিলা থেকে বেরিয়ে গেলে যেন মিথিলার গৌরব ম্লান হয়ে যাবে। তখন বাসুদেব সমগ্র ন্যায় কণ্ঠস্থ করে নিল। আর নকল করার দরকার হল না।

মায়াবাদে বিশ্বাসী বাসুদেব, অদ্বৈত বেদান্তে পারঙ্গম। ন্যায়ের অধ্যাপনা তো করেই, সন্ন্যাসীদের বেদও পড়ায়। কুতর্ককর্কশ —ভক্তিবাদের ধার ধরে না, তর্কে ভক্তিবাদের নিরসন করে।

কিন্তু এ কী, এ কে অপরূপ পুরুষ? এত সৌন্দর্য, এত প্রেমবিকার আগে কখনো দেখেনি সার্বভৌম। পাছে কেউ নির্যাতন করে, সার্বভৌম প্রভুকে আবরণ করে দাঁড়াল। কিন্তু

অনেকক্ষণ কেটে গেল, তবু প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল না। এদিকে জগন্নাথের ভোগের সময় উপস্থিত। মন্দির তাই বন্ধ হবে এখুনি।

তবে উপায় ?

সার্বভৌম বললে, 'এঁকে আমার বাড়িতে বয়ে নিয়ে চলো।'

মন্দিরের ছড়িদাররা অবাক। এ অপরাধীকে আবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া কেন ? একে আবার কিসের আপ্যায়ন ?

সার্বভৌম বললে, 'ইনি মহাপুরুষ। দেখেই বুঝতে পারছি কৃষ্ণমহাপ্রেমের সমস্ত সাত্ত্বিকভাব এঁর দেহে পরিস্ফুট।'

ভক্তিবাদের বিরোধী হলেও কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ কী তা সার্বভৌমের জানা ছিল। সন্দেহ নেই—এ নবীন সন্ন্যাসী নিত্যসিদ্ধ, তার মধ্যে উদ্দীপ্ত ভাবের প্রকাশ যা একমাত্র কৃষ্ণ-প্রেয়সীদের বৈশিষ্ট্য। সেই মহাভাব এই মর্ত মানুষের মধ্যে সম্ভব কী করে ?

প্রভুকে নিজ বাড়িতে নিয়ে এল সার্বভৌম। পবিত্র স্থানে ও আসনে শুইয়ে দিল। কিন্তু প্রভুর শ্বাস নেই স্পন্দন নেই, আয়ত নয়ন আধবোজা। নাকের কাছে তুলো ধরে দেখল, না, তুলো অল্প-অল্প নড়ছে। ক্ষীণ হলেও শ্বাস আছে, একেবারে নিঃশেষ হয়নি। সন্দেহ নেই, এ প্রলয়-নামক সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ।

কিন্তু কতক্ষণে ফিরে আসবে বাহ্যজ্ঞান ? শিয়রে বসে অপেক্ষা করতে লাগল সার্বভৌম। দেহলক্ষণ নিরীক্ষণ করতে লাগল।

এদিকে নয়নের অদর্শন হতেই অনুগামী ভক্তের দল ছুটল মন্দিরের দিকে। দ্বার-প্রান্তে পৌঁছে ব্যাকুলস্বরে জিগগেস করল, —একজন নবীন সন্ন্যাসীকে এদিকে আসতে দেখেছ ?

মন্দিরে পৌঁছেও জগন্নাথদর্শনের কথা তাদের মনে নেই। আগে প্রভু, পরে বিগ্রহ।

'দেখেছি।'

'দেখেছ ?'

'হ্যাঁ, মন্দিরে ঢুকেই চেয়েছিল জগন্নাথকে কোলে নিতে। মূর্ছিত

হয়ে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। সার্বভৌম ভটচাজ তখন মন্দিরে ছিলেন, সন্ন্যেসীর জ্ঞান হয় না দেখে তাকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন।'

চলো যাই, কে সে সার্বভৌম, তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করি।

এমন সময় সেখানে গোপীনাথ আচার্যের আবির্ভাব।

নবদ্বীপের লোক, মুকুন্দর সঙ্গে আগে থেকে জানাশোনা। একি, তুমি কোত্থেকে? মুকুন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরল গোপীনাথ।

নিতাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে মুকুন্দ বললে, 'গোপীনাথ, বিশারদের জামাই, তার মানে সার্বভৌমের ভগ্নীপতি।'

'ও সব পরের কথা। এখন বলো প্রভু কোথায়?' গোপীনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'তোমাদের বলা হয়নি,' মুকুন্দ বললে, 'গোপীনাথ প্রভুর ভক্ত। শুধু ভক্ত নয়, তত্ত্বজ্ঞ।'

'তবে আর চিন্তা নেই, উনি নিশ্চয়ই সার্বভৌমের বাড়ি জানেন।' বললে নিতাই, 'এখানে লোকমুখে শুনে অনুমান করছি প্রভু সার্বভৌমের বাড়িতে আছেন। সেখানে আমাদের নিয়ে চলুন।'

গোপীনাথ নিয়ে গেল সবাইকে। তাদেরকে বাইরে রেখে দ্রুতপায়ে ঢুকল অন্তঃপুরে। ধূলিধূসর দেহে অচেতন হয়ে দীনবেশে শুয়ে আছেন গৌরহরি। মুখ দেখে সুখ হল বটে, কিন্তু অবস্থা দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হল। কতক্ষণে না-জানি ফিরে আসবে বাহ্যজ্ঞান!

সার্বভৌমকে বললে, 'এ সন্ন্যাসীর সঙ্গের লোকেরা এসেছে। অপেক্ষা করছে বাইরে।'

'নিয়ে এস ভিতরে।'

ভিতরে এসে প্রভুকে দেখে ভক্তবৃন্দ আশ্বস্ত হল। সার্বভৌম প্রভুকে সেবা-যত্ন ঠিকই করছে। খুব বেশি উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই, প্রভুর এই ধ্যানমূর্ছা দীর্ঘস্থায়ীই হয়ে থাকে।

নিত্যানন্দকে প্রণাম করল সার্বভৌম। শুনল তাদের এখনো

জগন্নাথদর্শন হয়নি। পুত্র চন্দনেশ্বরকে বললে, 'এঁদেরকে দর্শন করিয়ে নিয়ে এস।'

মন্দিরে নিয়ে এসে চন্দনেশ্বর বললে, 'স্থির হয়ে দেখবেন জগন্নাথকে! আপনাদের আরেক গোসাঁই তো মাথা ঘুরে আছাড় খেয়ে পড়লেন—'

হাসতে লাগল ভক্তদল। 'আমাদের জন্যে চিন্তা নেই।'

প্রকট পরমানন্দ জগন্নাথকে দেখে আবেশ লাগল সকলের। কাঁদতে লাগল নিত্যানন্দ। মন্দিরের সেবক সকলকে মালা-প্রসাদ এনে দিল। প্রসাদে প্রসন্ন হল সকলে।

চলো এবার তবে মহাপ্রভুর কাছে ফিরে যাই।

গিয়ে দেখল নবদ্বীপচন্দ্র তখনো সমাহিত। সার্বভৌম ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় বসে আছে পদতলে। ভক্তদল গৌরহরিকে ঘিরে বসে উচ্চস্বরে নামকীর্তন সুরু করল। তৃতীয় প্রহরে প্রভুর চেতনা ফিরে এল, হরি-হরি বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠে বসলেন। স্থির হয়ে জিগগেস করলেন নিতাইকে, 'এখানে আমি কী করে এলাম?'

নিতাই বললে, 'জগন্নাথ দেখামাত্র তুমি আনন্দ-আবেশে মূর্ছা গেলে। মন্দিরে সার্বভৌম উপস্থিত ছিল, সে তোমাকে তার ভবনে নিয়ে এসেছে।'

'জগন্নাথকে দেখামাত্রই ইচ্ছে হল তাকে বুকে করি, উন্মত্তের মত বাহু বাড়িয়ে ছুটলাম তাকে ধরতে। তারপর কী হল আর মনে নেই।' বললেন মহাপ্রভু।

'জগন্নাথ দেখি চিত্ত হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষ-মাঝে থুই আপনার॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥'

'দৈবে সেখানে সার্বভৌম ছিল', নিতাই তাকাল সার্বভৌমের দিকে, 'সে তোমাকে সঙ্কট থেকে রক্ষা করেছে।'

'জগন্নাথের কী কৃপা !' বললেন গৌরহরি, 'সার্বভৌমের সঙ্গে আমার মিলন ঘটাল !'

সার্বভৌম কাছে এল। 'নমো নারায়ণ' বলে প্রণাম করল প্রভুকে।

প্রভু বললেন, 'কৃষ্ণে মতিরস্তু।'

মতি থেকেই রতি জাগবে। আর আগুন যে আধারে থাকে তাকেও যেমন উত্তপ্ত করে, তেমনি আনন্দস্বরূপা কৃষ্ণরতি যে ভক্তে থাকে, তাকেও আনন্দিত করে রাখে। এমন আনন্দ যে বিচ্ছেদেও কৃষ্ণস্ফূর্তি।

ব্রজাঙ্গনার রতি স্বভাবজা, রাধিকার স্বরূপজা। অনাদিসিদ্ধা। এ রতির উৎপাদক কোনো হেতু নেই। তবে বাহ্যবস্তু কিছু আছে যা এ রতিকে উদ্দীপিত করে। যেমন শব্দ, বেণুশব্দ ; স্পর্শ, অঙ্গস্পর্শ ; যেমন দর্শন, রূপদর্শন। যেমন বা রসাস্বাদন, কৃষ্ণের চর্বিত তাম্বুল খেয়ে রাধিকার দেহে সাত্ত্বিক বিকারের আবির্ভাব। যেমন বা সম্বন্ধ-চিন্তন। কার এমন সৌন্দর্য মাধুর্য গাম্ভীর্য বৈদগ্ধ্য, শৌর্য বীর্য সৌশীল্য ? কার এমন লোকোত্তর চরিত্র ? এমন জগৎচমৎকৃতিকরী লীলাই বা কার। এ সব দেখে শুনে ভেবে চিন্তে কোন রমণী থাকবে ধৈর্য ধরে ?

সার্বভৌম বললে, 'এখানেই আপনাদের আজ মধ্যাহ্নকৃত্য হবে। জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আমি আজ ভিক্ষে দেব।'

স্বগণদের নিয়ে প্রভু গেলেন সমুদ্রস্নানে।

স্নানান্তে বসলেন ভোজনে। সোনার থালায় সার্বভৌম পরিবেশন করতে লাগল।

'এত পিঠা-পানা আমি খেতে পারব না।' বললেন মহাপ্রভু, 'এসব আমার সঙ্গীদের দাও। আমাকে কিছু লাফরা তরকারি দিলেই চলবে।'

'তা কী করে হয় ?' আপত্তি করল সার্বভৌম। 'এ সমস্তই

জগন্নাথকে নিবেদন করা হয়েছে। আপনি আস্বাদ করে দেখুন জগন্নাথের রোচনীয় হবে কি না।'

একে একে সমস্ত রান্না খাওয়াল প্রভুকে।

ভোজনান্তে গোপীনাথকে জিগগেস করল, 'এ কে? কৃষ্ণে মতিরস্ত শুনে মনে হচ্ছে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, কৃষ্ণভক্ত। এর পূর্বাশ্রম কোথায়?'

'নবদ্বীপে।' বললে গোপীনাথ, 'জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র। নীলাম্বর তোমার বাবার সহপাঠী ছিলেন—'

তবে আর কথা কী। যিনি এসেছেন তিনি সার্বভৌমের নিজ জন। আত্মার আত্মীয়।

'সহজেই তুমি আমার পূজ্য।' গৌরহরিকে বললে সার্বভৌম, 'আর যেহেতু তুমি সন্ন্যাস নিয়েছ, আমি তোমার দাস ছাড়া কিছু নই।'

গৌরহরি বিষ্ণু স্মরণ করলেন। বললেন, 'সে কী বলছেন? আপনি জগদ্গুরু, সর্বলোকের হিতকর্তা। সন্ন্যাসীদেরও বেদান্ত পড়ান আপনি। আমিও সন্ন্যাসী, বালক সন্ন্যাসী, সুতরাং আপনি আমারও গুরু। আপনার সঙ্গ পাবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি। মন্দিরে আজ যা বিপদে পড়েছিলাম, আপনি না থাকলে আর নিস্তার ছিল না।'

'তুমি আর একা-একা যেওনা মন্দিরে।' সার্বভৌম সাবধান করে দিল: 'হয় আমাকে সঙ্গে নিও, নচেৎ আমাকে বোলো, আমি লোক দিয়ে দেব।'

'না, আমি মন্দিরের অভ্যন্তরে যাব না, গরুড়স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে দর্শন করব।' প্রভু আশ্বস্ত করলেন।

সার্বভৌম গোপীনাথকে বললে, 'দর্শনকালে প্রভুর সঙ্গী হবে।' আরো বললে, 'আমার মামীর বাড়িটি নির্জন, সেখানে ওর থাকবার বন্দোবস্ত করো। যা প্রয়োজন সব যোগাড় করে দাও।'

প্রভু ও তাঁর সঙ্গীরা সার্বভৌমের মামীর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

গোপীনাথ একদিন প্রভুকে শয্যোত্থান দর্শন করিয়ে আনল। জগন্নাথ যখন প্রথম শয্যা থেকে উঠছে, সেই সময়কার দর্শন।

মুকুন্দ দত্ত নিয়ে এল সার্বভৌমের কাছে।

'এ সন্ন্যাসী প্রকৃতি-বিনীত, দেখতে সুপুরুষ। এঁর উপর আমার প্রীতি ক্রমশই বাড়ছে, বেড়ে চলেছে। কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ইনি? এর নাম কী?' গোপীনাথকে লক্ষ্য করল সার্বভৌম।

গোপীনাথ বললে, 'এঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। গুরু কেশব ভারতী।'

'নামটি সর্বোত্তম হয়েছে।' বললে সার্বভৌম, 'কিন্তু সম্প্রদায়টা মধ্যমশ্রেণীর।'

'কিন্তু প্রভুর সে বাহ্যাপেক্ষা নেই।' বললে গোপীনাথ, 'কোন সম্প্রদায় ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা মানী বা অমানী, এ সব বিচার করবার অবকাশ ছিল না। কোনো প্রকারে সংসার ত্যাগ করা উদ্দেশ্য, তাই সন্ন্যাস গ্রহণের সময় সম্প্রদায় নিয়ে মাথা ঘামাননি। মিথ্যে গৌরবের প্রতি মোহ নেই এক বিন্দু।'

'কিন্তু এর তো এখন পূর্ণ যৌবন।' সার্বভৌম চিন্তান্বিত মুখে বললে, 'এ সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করবে কী করে? চঞ্চল ইন্দ্রিয়কে কী করে শাসনে রাখবে? তবে এক কাজ করি। ওকে নিরন্তর বেদান্ত পড়াই, বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে নিয়ে যাই।'

অদ্বৈতমার্গ শঙ্করাচার্যের সাধনপথ। কী বলে অদ্বৈতমার্গ? বলে—জীবে ব্রহ্মে ভেদ নেই। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম, তেমনি ব্রহ্মের বদলে ভুল করে জগৎ প্রপঞ্চকে দেখছি। ব্রহ্মই বস্তুরূপে প্রতিভাত। আর কী বলে? বলে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, তার কোনো আকার নেই, শক্তি নেই, গুণ নেই, শুধু সে এক বৈচিত্র্যহীন আনন্দসত্তা। আর এই ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্যপ্রাপ্তিই অদ্বৈতবাদীর লক্ষ্য।

আর বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গ অর্থ, যে অদ্বৈতমার্গে বৈরাগ্যের সুরটি সবলে উচ্চারিত।

'আর যদি উনি অনুমতি করেন', বললে সার্বভৌম, 'ওকে দিয়ে নতুন করে উত্তম সম্প্রদায় থেকে সন্ন্যাস নেওয়াই।'

কথা শুনে গোপীনাথ ও মুকুন্দ দুজনেই বিমর্ষ হল। সার্বভৌম বোধ হয় মনে করেছে—এ একজন সামান্য সন্ন্যাসী, বিচার-বিবেচনা না করেই সন্ন্যাস নিয়ে ফেলেছে। সম্প্রদায়ের তাৎপর্যের ধার ধারেনি।

তখন গোপীনাথ গর্জন করে উঠল: 'ভটচাজ, তুমি এঁর মহিমা কিছুই জানো না, বোঝওনি কিছু। ইনিই ভগবত্তার শেষ সীমা, চরম বিকাশ। ইনিই স্বয়ং ভগবান। তা এ কথা অজ্ঞ লোকে বিশ্বাস করবে না। বিজ্ঞজনেই পারবে অনুভব করতে।'

'কিন্তু কেন?' সার্বভৌমের শিষ্যের দল কোলাহল করে উঠল: 'কেন ওঁকে ঈশ্বর বলবে? প্রমাণ কী?'

'যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁদের অনুভবই প্রমাণ।' বললে গোপীনাথ, 'তাঁরা সাধন দ্বারা অনুভব করেছেন কী ঈশ্বর-লক্ষণ।'

'তার অর্থ, অনুমান করে ঈশ্বরতত্ত্ব স্থাপন করো।' শিষ্যের দল বললে, 'ঘট দেখে যখন কুম্ভকারকে অনুমান করি, তেমনি জগৎ সংসার দেখে এর এক সৃষ্টিকর্তাকে অনুমান করব?'

'এই অনুমানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব হয়তো বা নির্ধারণ করা যেতে পারে, কিন্তু অনুমানে ঈশ্বরকে, ঈশ্বরতত্ত্বকে জানা যায় না।' গোপীনাথ বললে, 'অনুমানে নয়, প্রত্যক্ষজ্ঞানেই ঈশ্বরতত্ত্ব গোচরীভূত। কিন্তু যাই বলো, ঈশ্বরের কৃপা না হলে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব।'

'শিষ্য কহে—ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য কহে—অনুমানে নহে ঈশ্বরজ্ঞানে॥
অনুমান প্রমাণে নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপা বিনে ঈশ্বরতত্ত্ব কেহো নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে।
সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥'

যে দুটি চরণকমলের প্রসাদলেশ পেয়েছে, সেই জানতে পারে ঈশ্বরমহিমার স্বরূপ। সেই তো তাঁকে দেখতে পারে চোখ দিয়ে, শুনতে পারে কান দিয়ে, ছুঁতে পারে হাত দিয়ে। নচেৎ একাকী থেকে শুধু যোগাভ্যাসে বা শাস্ত্রালোচনায় বা বিচিত্র বিচারে বা অনুসন্ধানে তাঁর কিছুই নির্ণয় হয় না।

সার্বভৌমকে লক্ষ্য করে গোপীনাথ বললে, 'তুমি শাস্ত্রবেত্তা হতে পারো, কিন্তু তোমাতে ঈশ্বরের কৃপালেশ নেই, তাই সাধ্য কি তুমি ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝো। তোমার শাস্ত্রই তো বলে, শুধু পাণ্ডিত্যে বোঝা যায় না ঈশ্বরতত্ত্ব।'

'কিন্তু তোমাতে তাঁর কৃপা হয়েছে, তারই বা প্রমাণ কী?' সার্বভৌম রুক্ষস্বরে বললে।

'প্রমাণ, আমি বস্তুকে বস্তু বলে জেনেছি। আর তুমি এঁর শরীরে মহাপ্রেমাবেশ দেখেও চিনতে পারছ না। তুমিই বলো, এ মহাপ্রেমাবেশ কি ঈশ্বরলক্ষণ নয়? তাই তো বলি, আমাতে কৃপা আছে, তোমাতে নেই। তোমাতে শুধু মায়া, তুমি মায়াচ্ছন্ন।'

হাসল সার্বভৌম। বললে, 'রুষ্ট হয়ো না। আমি শাস্ত্রদৃষ্টে কথা বলি। তত্ত্বনির্ণয়ের অনুরোধে বিচার-বিতর্ক করতে ভালোবাসি। আমার বক্তব্য আমাকে বলতে দাও।'

'বলো।'

'শাস্ত্রে আছে, কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নেই। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগেই তাঁর অবতার হয়, তাই তো বিষ্ণুর নাম ত্রিযুগ। সুতরাং তোমার ঐ শ্রীচৈতন্য অবতার হতে পারেন না।' সার্বভৌম গম্ভীর হল: 'তবে তিনি যে মহাভাগবত, তাতে সন্দেহ নেই।'

'তোমার দেখি অভিমানের শেষ নেই। মহাভারত ও ভাগবত—এই দুই মহাশাস্ত্রের কথা কি ভুলে গিয়েছ? তারা বলছে, কলিতে লীলাবতার না হতে পারে, কিন্তু যুগাবতার হতে বাধা নেই। কিন্তু

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যুগাবতার নন, তিনি স্বয়ং ভগবান।' গোপীনাথ বিরক্তমুখে বললে, 'তোমাকে কী বোঝাব, ঊষর ভূমিতে বীজ বপন নিষ্ফল। যখন তোমার উপর তাঁর কৃপা হবে, তখন বুঝবে আমার সিদ্ধান্ত ঠিক কি না।'

হাসতে লাগল সার্বভৌম।

ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং নরং॥' যার কামনা নেই, যার আবার সকল কামনাই বর্তমান, কিংবা যে উদারবুদ্ধি মোক্ষকামী, সকলেই একান্ত ভক্তিতে পরমপুরুষ বিষ্ণুর উপাসনা করবে। অন্যথা সমস্ত বিফল।

সূর্য প্রত্যহ উদিত ও অস্তমিত হয়ে মানুষের পরমায়ু বৃথা হরণ করছে। যার জীবন হরিগুণকীর্তনে কেটে যায় তারই আয়ু ফলান্বিত। পাদপেরও তো জীবন আছে। ভস্ত্রাও তো নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া করে। গ্রাম্য পশুরাও তো আহার-বিহারে অভ্যস্ত। কিন্তু হরিনাম যার কর্ণপথে কখনো প্রবেশ করেনি সে পশু ছাড়া আর কী। যে কখনো হরিকথা শোনেনি তার শ্রোত্রদ্বয় বিবরমাত্র। যে জিহ্বা হরিগুণগানে বিরত তা ভেকজিহ্বা। যে মাথা মুকুন্দের পদারবিন্দে প্রণত নয়, তা পট্টবস্ত্রে বা কিরীটে সুশোভিত হলেও দেহের বৃথা ভার মাত্র। যে হাত হরিচরণে কুসুমাঞ্জলি দেয় না তা কাঞ্চনবলয়ে ভূষিত হলেও মৃত মানুষের হাতের মতই অসার। যে চোখ হরির রূপ দেখে না তা ময়ূরপাখায় আঁকা চোখের মতই অনর্থক। চরণ থাকতেও যে হরিক্ষেত্রে যায় না সে তো নিশ্চল বৃক্ষমূল। আর যে হরিপাদলগ্ন তুলসীর আঘ্রাণ না নেয় তার শ্বাস থাকলেও সে শব-স্বরূপ। আর পাষাণতুল্য কঠিন তার হৃদয় যার হরিনামে ভক্তি-বিকার জন্মে না আর বিকার জন্মালেও নয়নে অশ্রু আসে না আর অঙ্গে লাগে না রোমহর্ষ।

ভক্তিমার্গই সমীচীন মঙ্গলদায়ক। একমাত্র অকুতোভয়।

৪৩

প্রভু সার্বভৌমের মন্তব্য শুনলেন। তাঁর নামটি ভালো, কিন্তু সম্প্রদায় ভালো নয়। বয়স অল্প, ইন্দ্রিয়দমন অসাধ্য! ভালো একজন সন্ন্যাসী ডাকিয়ে নতুন করে তাঁর সংস্কার করে নেবে। শুধু তাই নয়, সার্বভৌম নিজে ক্লেশ করে তাঁকে বেদ পড়াবেন, ঢুকিয়ে দেবেন অদ্বৈতমার্গে।

প্রভু খুব খুশি, বললেন, 'ভট্টাচার্যের অসীম অনুগ্রহ।'

'অনুগ্রহ?' রেগে উঠল মুকুন্দ। 'অবজ্ঞা—এ অবজ্ঞা ছাড়া কিছু নয়।'

'না, না, অবজ্ঞা কেন হবে? ভট্টাচার্য আমার মঙ্গল চান, আমার সন্ন্যাস-রক্ষা করবার জন্যেই তাঁর এই করুণা।'

মন্দিরে প্রভুকে নিয়ে এল সার্বভৌম। বললে, 'তুমি সন্ন্যাসী, তুমি সর্বদা বেদান্ত পড়বে, বেদান্ত শুনবে। তাই সন্ন্যাসীর বিধি, সন্ন্যাসীর ধর্ম।'

'আপনি যা বলবেন, তাই হবে। তাই করব।' বিনয়ে বললেন গৌরহরি।

সার্বভৌম বেদান্ত পড়াতে বসল।

ছাত্র কী গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে। তদ্গত-তন্ময়। কথাটি কইছে না।

সাত-সাত দিন পড়ানো হচ্ছে, একটিও কথা নেই ছাত্রের মুখে। সামান্য একটা প্রশ্নও নয়। সন্ন্যাসী কি তবে বদ্ধ পাগল, না, নির্বোধ? ভালো-মন্দ কিছুই তবে বলছে না কেন? তবে কি দাম্ভিক? তাও তো মনে হবার নয়। অমন নম্র ও লাজুক ছাত্র দেখা যায় না।

'সাত দিন ধরে পড়ছ, হাঁ-না কিছুই বলছ না কেন?' প্রায় বিরক্ত হয়েই জিগগেস করল সার্বভৌম। 'বুঝছ কি বুঝছ না, অন্তত সেটুকু বুঝতে দেবে তো?'

'আমার শোনবার কথা, আমি শুনে যাচ্ছি।' বললেন গৌরহরি।

'আর আমি যে ব্যাখ্যা করছি, সঙ্গে-সঙ্গে তা বুঝছ?'

'আমি মূর্খ, আমার পড়াশোনাও কিছু নেই, তাই বুঝছি না কিছুই।'

'না বুঝলে জিগগেস করতে হয় তো?' ভট্টাচার্য মুখ-চোখ রুক্ষ করে উঠলেন: 'চুপচাপ বসে থাকলে চলে কী করে?'

বিনম্র মুখে প্রভু বললেন, 'বেদান্তসূত্রের অর্থ তো নির্মল, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যাই মেঘাচ্ছন্ন।'

বলে কী সন্ন্যাসী? নিশ্চল পাথর হয়ে গেল সার্বভৌম।

'সূত্রের অর্থ স্পষ্ট, কিন্তু শঙ্করাচার্য কল্পনাবলে অন্যরকম ভাষ্য করেছেন, আর আপনার ব্যাখ্যা শঙ্করভাষ্যের অনুযায়ী।' নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন গৌরহরি। 'যতক্ষণ শঙ্করভাষ্য থাকবে, ততক্ষণ ঠিক-ঠিক অর্থবোধ হবে না।'

শঙ্করভাষ্যে বলা হয়েছে, একমাত্র নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মই শ্রুতিসিদ্ধ। ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ, সর্বোপাধিবর্জিত। আর এই ব্রহ্মবস্তুই একমাত্র জ্ঞানগম্য। সুতরাং ভক্তি-উপাসনা অর্থহীন।

এ একরকমের নাস্তিক্য। সার্বভৌম ভট্টাচার্য এই মতের পরিপোষক।

খণ্ডন করতে বসলেন গৌরহরি।

ব্রহ্ম-র অর্থ কী? যিনি বড়, বৃহদ্‌বস্তু, তিনিই ব্রহ্ম। আবার যিনি অন্যকে বড় করেন, তিনিও ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্মে শক্তি বর্তমান, শক্তি না থাকলে বড় করেন কী করে? সুতরাং ব্রহ্ম শক্তিমান। আবার যিনি বড়, তিনি সব বিষয়ে বড়, তিনি সর্ববৃহত্তম। আর

বৃহত্তমতা গুণ ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং তিনি সগুণ, সবিশেষ। আর সবিশেষ হলেই সাকার। শক্তি আছে বলেই তাঁর বৈভব আছে, প্রকাশবৈচিত্রী আছে, আর এই প্রকাশবৈচিত্রীই তাঁর ঐশ্বর্য। সুতরাং ব্রহ্ম সর্বৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ ভগবান। 'সর্বৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান। তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান?'

শ্রুতি ব্রহ্মকে নিরাকার বলেও ধরে রাখতে পারেনি নিরাকারে। ব্রহ্মের হাত নেই, পা নেই, চোখ নেই বলেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার বলেছে, তিনি গ্রহণ করেন, তিনি চলেন, তিনি দেখেন। হাত না থাকলে ধরেন কী করে? পা না থাকলে চলেন কী করে? নিরিন্দ্রিয় হলে ইন্দ্রিয়েব কাজ থাকে কেন? আরো দেখুন। বলছে, এই আত্মা বহু অধ্যয়নে পাওয়া যায় না, না বা মেধায়, না বা বহুবেদ-শ্রবণে, এই আত্মা যাকে বরণ করেন, কৃপা করেন, একমাত্র তারই কাছে ইনি স্বীয় তনু বা স্বরূপকে প্রকাশ করেন। তা হলে আত্মার তনু আছে, মানে শরীর আছে। যদি তিনি অশরীরী, তবে আবার তিনি সতনু হন কী করে? এর সমাধান কী? এর সমাধান হচ্ছে এই ব্রহ্মেব প্রাকৃত শরীর নেই, প্রাকৃত আকার নেই, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নেই। ব্রহ্মেব দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়, চিন্ময়, অপ্রাকৃত। 'তাঁহার বিভূতি দেহ—সব চিদাকার।' সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত, অনন্তগুণসমন্বিত ও পূর্ণানন্দঘনমূর্তি।

শঙ্কর যে ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলতে চেয়েছে, তাতে তার দোষ নেই, কেননা, ভগবানের আদেশেই সে ও-রকম অর্থ করেছে। কিন্তু তাই বলে তুমি যেন ভগবানের নিন্দা শুনো না। তুমি যেন বোলো না ভগবানের ঐশ্বর্য নেই, ধাম নেই, লীলা নেই, লীলাপরিকর নেই। তাঁর বিগ্রহও সচ্চিদানন্দাকার। ঈশ্বরের অপ্রাকৃত দেহ বা বিগ্রহ যে না মানে, সে দর্শন-স্পর্শনের অযোগ্য। ভগবানের নিন্দা শুনলে যে স্থানত্যাগ করে উঠে না যায়, সে তার সমস্ত সুকৃতি থেকে বিচ্যুত হয়।

ঈশ্বরই জগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। বলতে পারো, জগৎ যদি ব্রহ্মের পরিণাম হয়, তবে তো ঈশ্বর বিকারী হলেন। না, নিজের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হয়েও অবিকৃত থাকেন। স্যমন্তক-মণি সোনার ভার প্রসব করে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার ক্ষয় বা বিকার ঘটে না। জগৎ ভ্রম নয়, মিথ্যা নয়, শুধু জীবদেহে আত্মবুদ্ধিই মিথ্যা। অদ্বৈতবাদীরা যে ভ্রম বলে, সেটাই ভ্রম। যা চোখের সামনে, চারদিকে দেখছি, তার অস্তিত্ব আদৌ নেই, এ হতে পারে না। অস্তিত্ব আছে, তবে এ নশ্বর, বিনাশশীল। অস্তিত্বই যদি না থাকে, তবে সৃষ্টি কী, ধ্বংসই বা কার?

প্রণবই ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ব্রহ্মঃ। পরিদৃশ্যমান জগৎই ওঙ্কার। ওঙ্কারই সর্বাশ্রয়, সর্বব্যাপক। যেহেতু প্রণব ব্রহ্মের স্বরূপ, সমস্ত বিশ্ব প্রণবের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রণবই বৃহত্তম বাক্য, আর সকল বাক্য প্রণবের চেয়ে ক্ষুদ্র। অথচ অদ্বৈতবাদী বলে, 'তত্ত্বমসি'-ই মহাবাক্য। প্রণব তো ঈশ্বরকেও বোঝায়, কিন্তু তত্ত্বমসি তা বোঝায় না। সুতরাং 'তত্ত্বমসি' প্রণবের চেয়ে ছোট। তত্ত্বমসি তাই মহাবাক্য হতে পারে না। অংশ কি কখনো পূর্ণের চেয়ে বড় হয়?

তত্ত্বমসি-র মানে কী? শঙ্কর জীবে-ব্রহ্মে অভেদ করতে চেয়েছিল, তাই সে মনে করেছে, তুমি জীব, তুমিই সেই ব্রহ্ম। কিন্তু ও-কথার আরেক অর্থও বিধেয়। শোনো। তস্য ত্বম্—তত্ত্বম্। অর্থাৎ তার তুমি। আর অসি অর্থ হও। সর্বসাকুল্যে অর্থ হচ্ছে, হে জীব, তুমি ব্রহ্মের হও। তুমি ব্রহ্মের আছ। তুমি ব্রহ্ম নও, তুমি ব্রহ্মের একজন। তুমি তাঁর দাস, দাসানুদাস। আর এ অর্থই ভক্তি-মার্গের।

এতক্ষণে তবে এসে গেল ভক্তির কথা। সম্বন্ধ বা প্রতিপাদ্য বিষয় হল ভগবান, অভিধেয় বা জীবের কর্তব্য হল সাধন-ভক্তি, আর প্রয়োজন হল ভগবৎপ্রেম। এই সম্বন্ধ, অভিধেয় আর প্রয়োজন—তিন বস্তুই বেদের বর্ণনীয় ব্যাপার।

কী রকম ভগবান? মধুর, মধুর, মধুর হতে মধুর—এর বেশি আর কে কী বলতে পারে? আর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ, সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। আর, ভক্তের প্রীতি-রস-আস্বাদনেই ভগবান আনন্দিত। সাযুজ্য-মুক্তিতে নির্বিশেষ ব্রহ্মে আনন্দ কই? সেখানে কোথায় তাঁর প্রেমবশ্যতার অবকাশ? কোথায় মাধুর্যের তরঙ্গ-লীলা?

কী রকম অভিধেয়? অভীষ্টকে পাবার জন্যে যে উপায়, তাই অভিধেয়। ভগবানকে কী করে জানা যায়, কী করে দেখা যায়? ভগবানকে জানলে আর ভয় থাকে না। সমস্ত পাশ-ক্লেশ নষ্ট হয়, জন্ম-মৃত্যুতে ছেদ পড়ে। আর দেখলেও তাই। হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূরে যায়, কর্মের ক্ষয় হয়ে সংসার-গতাগতির উপশম ঘটে। কিন্তু উপায় কোথায়? উপায় উপাসনায়।

যোগমার্গে সকলের অধিকার নেই। যে মনকে বশীভূত করতে পারে, সেই যোগের যোগ্য। যোগের জন্যে শুচি দেশ ও সুখাসনের দরকার। যোগ তাই অন্য-নিরপেক্ষ নয়। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাই। জ্ঞানও ফলবন্ত হতে ভক্তির অপেক্ষা রাখে। জ্ঞানও অধিকারভেদের প্রশ্ন তোলে। শুধু শুদ্ধচিত্ত লোকই জ্ঞান-সাধনের অধিকারী।

সুতরাং যোগ বা জ্ঞান অভিধেয় হলেও, শ্রেষ্ঠ অভিধেয় নয়।

শ্রেষ্ঠ অভিধেয় ভক্তি। ভক্তি স্বতন্ত্র, অন্যনিরপেক্ষ। সার্বত্রিক। সমস্ত অবস্থায়, সমস্ত স্থানে, সমস্ত সময়ে। সমস্ত নিয়ম-নিষেধের নাগালের বাইরে। ভক্তি সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে স্বাভাবিক, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।

আর প্রয়োজন—কিসের প্রয়োজন?

যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে উপাসনা, তাই প্রয়োজন। উপাসনায় কী চাই? সংসারভয় থেকে, ত্রিতাপজ্বালার থেকে উদ্ধার চাই। কিন্তু কে উদ্ধার চায়, যদি সে বোঝে যে জন্ম-জন্ম হৃদয়ের মধু দিয়ে পরমমধুরের সেবা করতে পারবে? নৃসিংহকে কী বলেছিল প্রহ্লাদ?

বলেছিল, কর্মফলে আবার হাজার-হাজার জন্ম ঘুরে বেড়াতে হবে, কিন্তু যে-জন্মে যেখানেই থাকি না কেন, তোমাতে আমার ভক্তি যেন অবিচ্যুত থাকে। ইন্দ্রিয়ভোগবিষয়ে অবিবেকীর যেমন অবিচ্ছিন্ন প্রীতি, তেমনি আমার হৃদয়ে যেন তোমার প্রতি সে রকম রতি থাকে, আর সেই রতিতেই তোমাকে স্মরণ করি অহর্নিশ। রসস্বরূপকে পাওয়া অর্থই সেব্যরূপে পাওয়া। আর এই সেবা-বাসনাকে উদ্বোধিত করবার জন্যেই উপাসনা। আর যখন সেবা থেকে আনন্দ, সেই আনন্দই প্রেম। প্রেমই পরম প্রয়োজন।

এই তিন বস্তু,—সম্বন্ধ, অভিধেয় আর প্রয়োজন ছাড়া আর যা-যা শঙ্করাচার্য বলেছে, সমস্তই কল্পনাবলে। শঙ্করাচার্য মহাদেবের অবতার। মহাদেব হয়ে শঙ্কর বেদের কল্পিত অর্থ কেন করবেন? ঈশ্বরের আদেশে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন শিবকে, তুমি আগমশাস্ত্রদ্বারা সকলকে আমার থেকে বিমুখ করো আর আমাকেও গোপন করে রাখো, যাতে সকলে বিষয়সুখে মত্ত হয়ে প্রজাবৃদ্ধিরই চেষ্টা করবে। 'আচার্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল। অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥'

সমস্ত শুনে সার্বভৌম জড়বৎ নিশ্চল।

নির্বিশেষবাদ খণ্ডন হল। স্থাপন হল সবিশেষবাদ। সম্বন্ধ ভগবান, অভিধেয় ভক্তি, প্রয়োজন প্রেম, সাব্যস্ত হল নতুন তত্ত্ব। সার্বভৌমের মুখে কথা সরে না। একেই আমি কিনা অর্বাচীন বালক ভেবেছিলাম।

সার্বভৌমের বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করলেন গৌরহরি। বললেন, 'এতে বিস্ময়ের কী আছে? ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ।'

পুরুষার্থ চারটি। ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ। পঞ্চম বা পরম পুরুষার্থই ভক্তি বা ভগবৎপ্রেম। এই প্রেম ব্রহ্মানন্দের চেয়েও লোভনীয়। এই প্রেম মহাধন। এই প্রেম কৃষ্ণের মাধুর্যরসের আস্বাদন করায়।

'প্রভু কহে—ভট্টাচার্য ! না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি—পরম পুরুষার্থ হয় ॥'

যারা আত্মারাম অর্থাৎ যারা আত্মাতে রমণ করে, অর্থাৎ যারা মায়ামুক্ত, যারা নির্গ্রন্থ অর্থাৎ যারা অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য, তারাও শ্রীহরিতে অহেতুকী ভক্তি করে থাকে। জানবে এমনই শ্রীহরির গুণ।

'দয়া করে এই শ্লোকটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করুন।' সার্বভৌম হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠল।

কেন এই চাঞ্চল্য ? সার্বভৌমও কি ভক্তির কথা শুনতে চায় ?

প্রভু বললেন, 'তুমি আগে ব্যাখ্যা করো।'

বিবিধ রকম অর্থ করল সার্বভৌম।

'তুমি বৃহস্পতি'। বললেন প্রভু, 'এমন কেউ নেই তোমার মত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু তুমি নয় রকম অর্থ করলে বটে, কিন্তু আমার মনে হয় ওদের বাইরে আরো অর্থ নিহিত আছে।'

আঠারো রকম অর্থ করলেন প্রভু। সার্বভৌমের নয় অর্থের একটা অর্থও না ছুঁয়ে।

এই নবীন সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই মানুষ নয়। সার্বভৌমের চিত্তে দৈন্য উপস্থিত হল, ধুলো হয়ে গেল পাণ্ডিত্যের অভিমান। জাগল আত্মধিক্কার।

জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকলেও, হে নাথ, আমি জানি, আমি তোমারই অধীন। আমি তোমার থেকেই জন্ম গ্রহণ করেছি কিন্তু তুমি আমার অধীন নও, তুমি আমার থেকে সঞ্জাত হওনি। তরঙ্গ ও তরঙ্গিত সমুদ্রে ভেদ না থাকলেও এ নিশ্চিত যে তরঙ্গই সমুদ্রের, কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের নয়।

অহঙ্কার ছাড়া আর কী আছে সন্ন্যাসে ? 'বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে। প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কারপাশে ॥' দণ্ড ধরেই নিজেকে মহাজ্ঞানী ভাবে, কোথাও হাত জোড় করে না। ভগবান অন্তর্যামীরূপে নিজ অংশে সকল দেহেই প্রবিষ্ট আছেন তবু ধর্মধ্বজী

সন্ন্যাসীরা তাদের প্রণাম করে না। জীবের স্বভাবধর্ম ঈশ্বরভজন, তা না করে নিজেকে নারায়ণ বলে মানে। গর্ভবাসে যে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করলেন, যার প্রসাদে তার জ্ঞান বুদ্ধি হল, যার ইচ্ছায় সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় ঘটছে, সে আর কেউ নয়, সন্ন্যাসী নিজে। 'নিদ্রা হইলে আপনে কে ইহাও না জানে। আপনারে নারায়ণ বোলে হেন জনে॥' যে জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, তাকে যে ভক্তি করে সেই তো সুপুত্র। পুত্র কি নিজেই পিতা?

'তবে প্রভু, তুমি সন্ন্যাসী কেন?'

আমি 'সন্ন্যাসী' নই, আমি কৃষ্ণবিরহে উন্মাদ।

'প্রভু বোলে শুন সার্বভৌম মহাশয়।
সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইলুঁ শিখা সূত্র ঘুচাইয়া॥
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥'

প্রভুই কৃপা করলেন। সার্বভৌমের উপলব্ধি হল, এ সন্ন্যাসী কৃষ্ণ ছাড়া কেউ নন। পাণ্ডিত্যগর্বে প্রথমেই চিনতে পারিনি। আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম।

গর্ব নষ্ট হতেই সার্বভৌমের চিত্তে ভগবৎ-তত্ত্ব স্ফুরিত হল। দৃষ্টিতে লাগল দিব্যস্পর্শ।

দেখল, প্রভু তার সামনে ষড়ভুজমূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন!

পদতলে লুটিয়ে পড়ল সার্বভৌম। তার হৃদয়ের উপর করুণাসমুদ্র প্রভু তাঁর পাদপদ্ম রাখলেন। সার্বভৌমের সর্বদেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল। কাঁদতে লাগল দীনহীনের মত।

খবর পেয়ে ছুটে এল গোপীনাথ। কী ভীষণ কথা, সার্বভৌম নাচছে।

'সেই ভট্টাচার্যের এই গতি সম্ভব হল?' প্রভুকে লক্ষ্য করল

গোপীনাথ : 'সেই শুষ্কজ্ঞানী তার্কিক পণ্ডিত ভক্তিরসের ভাবুক বনে গিয়েছে।'

'সে একমাত্র তোমারই সঙ্গগুণে।' বললেন প্রভু, 'তুমি ভক্ত, তোমার সান্নিধ্যহেতুই জগন্নাথ একে কৃপা করলেন।'

ভট্টাচার্য প্রভুর স্তুতি করতে লাগল। নির্মম লৌহপিণ্ডকে তুমি নবনীতে পরিণত করলে। রজ্জু ছাড়াই বাঁধলে বন্যহস্তীকে। জলসেক ছাড়াই জুড়িয়ে দিলে হৃদয়দাহ। কঠিন বজ্র অমৃতসরস হয়ে উঠল।

'জগৎ নিস্তারিলে তুমি—সেহ অল্পকার্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি—যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥'

একদিন কী হল, প্রভু অতি প্রত্যূষে মন্দিরে গিয়ে শয্যোত্থান দর্শন করলেন। পূজারী মালা আর প্রসাদ দিল প্রভুকে। মালা আর প্রসাদ প্রভু বাঁধলেন আঁচলে। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলেন। বেগে চললেন রাস্তা দিয়ে।

তখনো সূর্যোদয় হয়নি। সার্বভৌমের ঘরে এসে পৌঁছুলেন।

তখনি সার্বভৌমের ঘুম ভাঙল। আর ঘুম ভাঙতেই সার্বভৌম বলে উঠল, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ!

কখনো ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণনাম বলিনি তো! এ কেমন হল?

সার্বভৌম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সামনেই দেখতে পেল প্রভুকে। পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল।

আঁচল থেকে প্রসাদান্ন খুলে প্রভু দিলেন সার্বভৌমকে। সার্বভৌমের প্রাতঃকৃত্য হয়নি, স্নান-সন্ধ্যা হয়নি, মুখধোয়া হয়নি, তবু সেই আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইতস্তত না করে নিমেষে খেয়ে ফেলল প্রসাদান্ন। চৈতন্যপ্রসাদে তার সমস্ত জাড্য, সমস্ত বিমুখতা চলে গিয়েছে।

প্রসাদ সাধারণ অন্ন নয়, চিন্ময়বস্তু। তাই সে শুকনো হোক,

বাসি হোক, দূরদেশ থেকে আনা হোক, কালহরণ না করেই তা ভোজন করবে। প্রসাদের সাক্ষাতে কোনো সময়ের বিচার করবে না। দিনে-রাত্রে যখনই তা উপস্থিত হবে, তখনই তা ভক্ষণ করবে সানন্দে।

অন্ন-প্রসাদ মহাপ্রসাদ। আর তা কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট বলেই মহা-প্রসাদ। 'কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।' মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য কেন? যেহেতু নিবেদিত বস্তুতে কৃষ্ণের অধরামৃতের স্পর্শ লাগে। 'এই দ্রব্যে এত স্বাদু কাঁহা হৈতে আইল। কৃষ্ণের অধরামৃত ইহাঁ সঞ্চারিল।'

প্রসাদে সার্বভৌমের শ্রদ্ধা দেখে প্রভু সার্বভৌমকে প্রেমাবেশে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'আজ আমার ত্রিভুবন জয় হল, আজ আমি বৈকুণ্ঠে আরোহণ করলাম। সার্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয়েছে।'

দুজনে নাচতে লাগল বাহুবদ্ধ হয়ে।

'আজ তুমি নিষ্কপটে কৃষ্ণাশ্রয় হলে।' বললেন গৌরহরি, 'আজ কৃষ্ণও তোমাকে নিষ্কপটে দান করলেন প্রেমভক্তি।' আরো বললেন, 'তোমার দেহে আত্মবুদ্ধি দূর হল, দূর হল মায়াবন্ধন। তুমি কৃষ্ণ-প্রাপ্তির যোগ্য হলে। আর কথা কী! বেদধর্ম লঙ্ঘন করে তুমি প্রসাদভক্ষণ করেছ।'

সার্বভৌমকে নাচতে দেখে গোপীনাথ পরিহাস করে উঠল। 'সে কী, তুমি নাচছ কী বলে? আর এ কি নাচ হচ্ছে, না, লাফ দিচ্ছ পাগলের মত? তোমার পড়ুয়ারা কী বলবে? জগজ্জনে কী বলবে?'

সার্বভৌম বললে, 'যার যা খুশি বলুক, নিন্দে করুক, আমরা বিচার করব না। হরিরসের মদিরা পান করেছি, এখন আমরা নাচব, লাফাব, মাটিতে পড়ব, ধুলোয় গড়াগড়ি দেব—কে আমাদের বাধা দেয়।'

সার্বভৌমের সমস্ত অভিমানের খণ্ডন হল। চৈতন্যচরণ বিনা আর আশ্রয় নেই, ভক্তি ছাড়া আর নেই শাস্ত্রব্যাখ্যা।

জগন্নাথদর্শনে বেরিয়ে সার্বভৌম চলে এল প্রভুর কাছে। বললে, 'সাধনভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী তাই জানতে এসেছি।'

প্রভু বললেন, 'নামসংকীর্তন। হরিনাম ছাড়া কলিতে আর গতি নেই। শুধু হরিনাম করো। হরিনামই কলির সাধন। ধ্যান যোগে তপস্যা কলিকালের নয়। কলিকালে নামই পরম উপায়।'

জগন্নাথ দর্শন করে সার্বভৌম ঘরে ফিরল। সঙ্গে দামোদর আর জগদানন্দ। একটি তালপাতায় প্রভুর উদ্দেশে দুটি শ্লোক লিখল। মহাপ্রসাদ আর সেই তালপাতা জগদানন্দের হাতে দিল। বললে, 'যাও, প্রভুকে দিয়ে এস।'

জগদানন্দের হাত থেকে তালপাতা নিয়ে আগে পড়ল মুকুন্দ। নিজে কণ্ঠস্থ তো করলই, বাইরে প্রাচীরগাত্রে সেই শ্লোক দুটি লিখে রাখল।

প্রভুকে সেই তালপাতা দিতেই পড়ে ছিঁড়ে ফেললেন। নিজের স্তুতি চান না শুনতে।

ভক্তকণ্ঠের রত্নহার সেই শ্লোক দুটো কী?

বৈরাগ্যবিদ্যা আর ভক্তিযোগ শেখাবার জন্যে করুণাসিন্ধু পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন—আমি তাঁর শরণ নিলাম।

যে ভক্তিযোগ কালপ্রভাবে নষ্ট হতে বসেছিল, তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধেয় যিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর চরণকমলে আমার চিত্তভৃঙ্গ প্রগাঢ়রূপে আসক্ত হোক।

আরেকদিন এসেছে সার্বভৌম। ভাগবতের ব্রহ্মস্তব পড়ছে।

'কবে ভগবানের কৃপা হবে—এই প্রতীক্ষায় জাগ্রত থেকে স্বীকৃত

কর্মফল ভোগ করতে-করতে যে কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার করে জীবন ধারণ করে, সেই ভক্তিপদে দায়ভাগী থাকে।'

প্রভু বললেন, 'কথাটা তো 'মুক্তিপদে' আছে, তুমি 'ভক্তিপদে' বলছ কেন?'

'ফল মুক্তি নয়, ফল ভক্তি।' বললে সার্বভৌম। 'মুক্তি তো দণ্ড বিশেষ। মুক্তি হলে ভগবৎ-সেবাসুখ থেকে বঞ্চিত হতে হল। যাতে সুখ নেই, তা দণ্ড ছাড়া আর কী?'

প্রভু হাসলেন, বললেন, 'পাঠ বদলাবার কী দরকার। মুক্তিপদ অর্থাৎ মুক্তি পদে যাঁর, সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে বোঝায়। কিন্তু তোমার মুক্তি-শব্দেই ঘৃণা আর ত্রাস, আর ভক্তি-শব্দে পরমানন্দ।'

যে শুধু মায়াবাদ পড়ত আর পড়াত, তার মুখে এখন ভক্তিছাড়া কিছু নেই। এ চৈতন্যপ্রসাদ ছাড়া আর কী। লোহাকে ছুঁয়ে যতক্ষণ না তাকে সোনা করা যায়, ততক্ষণ মণিকে কেউ স্পর্শমণি বলে না। সার্বভৌমের বৈষ্ণবতা দেখে এ আর কারু সন্দেহ রইল না যে, যে তাকে ছুঁয়েছে সে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন।

৪৪

নীলাচল ছেড়ে দক্ষিণে যাব এবার। তোমরা সম্মতি দাও সকলে।

'বা, দক্ষিণ কেন?'

'বিশ্বরূপকে খুঁজব।'

বিশ্বরূপ ষোল বছরে সন্ন্যাস নেয়, দু বছর পরেই পাণ্ডুপুরে দেহত্যাগ করে। শচীমাতা ছাড়া এ খবর সকলের জানা। তবে এ ছল কেন?

এ ছল বিনয়ের নামান্তর। দৈন্যের অবতার প্রভু কি বলতে পারেন—আমি জীবোদ্ধার করতে দক্ষিণে যাব? সামান্য দম্ভের কথাও যে তাঁর মুখে আসবে না।

'আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।'

'না, আমি একলা যাব।'

সকলের মাথায় যেন বাজ পড়ল। নিত্যানন্দ বললে, 'তা কী করে হয়? একলা যেতে কত কষ্ট। তোমার কষ্ট আমরা সইব কী করে? দক্ষিণের তীর্থপথ সমস্ত আমার জানা, বলো, আমি তোমার সঙ্গী হই।'

'না, কেউ আমার সঙ্গী হবে না।'

'কেন, আমার অপরাধ?'

প্রভু হাসলেন। বললেন 'তোমাদের গাঢ় স্নেহই আমার বিষয়কণ্টক। তোমাদের গাঢ় স্নেহে আমার কর্মভঙ্গ। তোমাদের জন্যে আমি কিছুই ইচ্ছামত করতে পারি না।' তাকালেন নিত্যানন্দের দিকে: 'সন্ন্যাস নিয়ে বৃন্দাবনে যাব স্থির করলাম, তুমি আমাকে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে নিয়ে এলে। সন্ন্যাসীর প্রধান সহায় যে দণ্ড তা ভেঙে দিলে নীলাচলে। জানি এ সমস্তই তোমার ভালোবাসার প্রকাশ, কিন্তু আমার কার্যহানি। সাধ্য নেই তোমার মনে, কারু মনে, আমি ব্যথা দিই। যেহেতু আমি নর্তক, তুমি সূত্রধর। যেমন নাচাও আমাকে, আমি তেমনি নাচি।'

জগদানন্দ বললে, 'কিন্তু আমাকে নেবে না কেন? আমার কী অপরাধ?'

'অহর্নিশ তোমার একমাত্র চেষ্টা কী করে আমাকে ভোগে-আরামে রাখবে। কী করে ভালো খাওয়াবে, ভালো পরাবে, শুতে দেবে ভালো বিছানা। কিন্তু আমি কি ও সব নিতে পারি? অথচ তোমার কথায় রাজি না হলে রাগ করে তুমি তিন দিন আমার সঙ্গে কথা বল না।'

'কিন্তু আমার দোষ কী?' জিগগেস করল দামোদর।

'আমি সন্ন্যাসী আর তুমি ব্রহ্মচারী মাত্র। কিন্তু সর্বক্ষণ আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরে আছ। তুমি আছ শুধু বিধিনিয়ম পালন করাতে, বিধিনিয়মের বাইরে আমাকে দিতে চাও না স্বাধীনতা। কৃষ্ণের জন্যে যে আমি একটু প্রাণ ভরে কাঁদব, তাতেও বাধা।' প্রভু ডাকলেন মুকুন্দকে: 'আর তুমি? তুমি কিছু বলছ না?'

মুকুন্দ অশ্রুনেত্রে দাঁড়িয়ে রইল নীরবে।

'তোমার দুঃখ দেখে আমার দুঃখ দ্বিগুণাকার হয়। শীতেও আমি তিনবার স্নান করি, মৃত্তিকায় শুই, এ তোমার কাছে অসহ্য। কিন্তু তুমি স্পষ্ট কিছু বল না, অন্তরে দুঃখী হয়ে বিষাদমুখে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি যে নিয়ম পালন করি, তাতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু আমার নিয়মপালনে মুকুন্দ দুঃখ পাচ্ছে—তাই আমার দুঃখ। ওর মুখের দিকে চাইতেও আমার বুক ফেটে যায়।'

যার যা গুণ তাই দোষ বলে কীর্তন করলেন প্রভু। 'দোষারোপ-চ্ছলে করে গুণ-আস্বাদন।'

'বেশ তুমি যখন বলছ তুমি একাই যাবে, আমাদের কাউকে নেবে না সঙ্গে, তখন তাই হবে।' বললে নিতাই, 'আমাদের সুখ-দুঃখ বিচার করব না, তোমার ইচ্ছাকেই শিরোধার্য করব! কিন্তু তোমার কৌপীন, বহির্বাস ও জলপাত্র কে বহন করবে? তোমার দু'হাত তো নাম-গণনায় আবদ্ধ থাকবে, তুমি নিজে তো বইতে পারবে না। তার পর প্রেমাবেশে যখন পথে অচেতন হয়ে পড়বে, তখন কে তোমার বস্ত্র-পাত্র রক্ষা করবে? অন্তত একজনকে সঙ্গে নাও।'

'কার কথা বলছ?' একটু কি নরম হলেন গৌরহরি?

'কৃষ্ণদাসের কথা। সরল বিনয়ী ব্রাহ্মণ, তোমার পাত্র-বস্ত্র ও বহন করবে আনন্দে।'

'বেশ, তাই নেব। এখন চলো সার্বভৌমের সঙ্গে দেখা করি।'

সর্বমঙ্গল উপস্থিত তার দুয়ারে, সার্বভৌম নিমাই-নিতাইকে পূজা করে আসন নিবেদন করল।

নিতাইকেও কি চিনেছে সার্বভৌম? প্রভুরই এক স্বরূপ, সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী যাকে বলেছিল দুর্বিজ্ঞেয়—বাৎসল্য দাস্য ও সখ্যের সমন্বয়, প্রভুর সহায়, লীলাসহচর। অকাতরে নির্বিচারে প্রেম বিলিয়ে যে প্রভুরই উদ্দেশ্যসিদ্ধির আনুকূল্য করছে।

প্রভু বললেন, 'অনুমতি করো। বিশ্বরূপের খোঁজে দক্ষিণে যাব। তোমার শুভ ইচ্ছায় আবার ফিরে আসব নির্বিঘ্নে।'

শেলের মত বুকে এসে বিঁধল সার্বভৌমের। বললে, 'প্রভু, তোমার বিরহ কি করে সহ্য করব? এর চেয়ে আমার নিজের মৃত্যু, পুত্রের মৃত্যুও সহনীয় ছিল। তুমি স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র, কে তোমাকে নিবৃত্ত করবে? তবু, কোন পথে তুমি যাবে, কী করে সইবে পথক্লেশ?'

'কেন কাতর হচ্ছ?' সান্ত্বনা দিলেন প্রভু। 'আমি সেতুবন্ধ পর্যন্ত যাব, আবার ত্বরিত ফিরে আসব। কৃষ্ণ সকলকে কৃপা করবেন।'

'তবে দিন কতক আরো থাকো। প্রাণ ভরে তোমার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করি। ষাঠীর মা, ব্রাহ্মণীকে বলি, তোমাকে ভিক্ষা দেন দিন কতক।'

চার দিন থেকে গেলেন প্রভু। তার পর মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথের কাছে আদেশ প্রার্থনা করলেন। প্রসাদী মালা এনে দিল পূজারী—তাই আজ্ঞামালা। মালা নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন, সমুদ্রতীর ধরে আলালনাথের উদ্দেশে অগ্রসর হলেন।

'তুমি এবার ফিরে যাও।' বললেন সার্বভৌমকে।

'প্রভু, আমার এক নিবেদন আছে।' বললে সার্বভৌম। 'গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে রামানন্দ রায় আছে। সে রাজ-প্রতিনিধি, বিষয়ী, জাতিতে কায়স্থ। তাই বলে তাকে উপেক্ষা কোরো না, দয়া করে দর্শন দিও। সে যেমন পণ্ডিত তেমনি ভক্ত।

তার সঙ্গে আলাপ করলেই বুঝতে পারবে। তাকে আমি এ যাবৎ 'বৈষ্ণব' বলে পরিহাস করেছি, তার কথা ও আচরণ কোনো কিছুরই মর্ম আমি বুঝিনি। তোমার কৃপায় এবার তার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। তুমি তাকে সম্ভাষণ করলেই বুঝবে তার মহত্ত্ব।'

দেখা দেবেন বলে প্রভু সম্মত হলেন। আলিঙ্গন করে বললেন, 'এবার তবে ঘরে ফিরে কৃষ্ণ ভজন করো। আর আশীর্বাদ করো আমি যেন তোমার প্রসাদে নীলাচলে ফের ফিরে আসি।'

চলে গেলেন প্রভু। সার্বভৌম মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তার দিকে প্রভু আর ফিরেও তাকালেন না। 'মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়। পুষ্পসম কোমল—কঠিন বজ্রময়॥'

নিত্যানন্দ সার্বভৌমকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

বাকি সকলে যুক্ত হল প্রভুর সঙ্গে। সমুদ্রের ধারে-ধারে হেঁটে-হেঁটে পৌঁছুল আলালনাথে।

আলালনাথকে প্রণাম করে নৃত্য সুরু করলেন প্রভু। দলে-দলে লোক এসে জড়ো হতে লাগল। চতুর্দিকে রব উঠল হরি-হরি, রব উঠল কৃষ্ণ-গোপাল। অরুণ বসনে মণ্ডিত এমন কাঞ্চনদেহ কেউ দেখেনি, দেখেনি এমন কম্প-স্বেদ, এমন পুলকাশ্রু। যে দেখে সেই চমৎকার গণে, ফিরে যেতে চায় না। ছেড়ে যেতে চায় না।

প্রভুর তা হলে দুপুরের ভিক্ষা জোটানো কঠিন হল।

'তোমরা কেন এত ভিড় করছ?' নিত্যানন্দ চাইল বোঝাতে। 'কথা দিচ্ছি, প্রতি গ্রামে এমনি নৃত্য হবে, তোমরা পাবে এই মহৎ সঙ্গ। এখন সকলে নিরস্ত হও, গাঁয়ে-ঘরে ফিরে যাও।'

কে কার কথা শোনে!

'চলো তোমাকে স্নান করিয়ে নিয়ে আসি।'

সমুদ্রে নিয়ে গেল প্রভুকে, আথালি-পাথালি লোক ছুটল। তাড়াতাড়ি স্নান করিয়ে আবার নিয়ে এল মন্দিরে। আর তক্ষুনি বন্ধ করে দিল দরজা।

গোপীনাথ প্রসাদ নিয়ে এসেছিল, নিমাই-নিতাইকে ভিক্ষা করাল। অবশিষ্ট বাকি সবাই ভাগ করে নিল।

'দরজা খোলো। দর্শন করতে দাও আমাদের।' জনতা উত্তাল হয়ে উঠল।

ভক্তদের সাহস হল না দরজা খোলে। কিন্তু প্রভু কতক্ষণ লোক-আর্তি সহ্য করবেন? বললেন, 'দ্বার মোচন করো।'

সন্ধ্যে পর্যন্ত চলল জনস্রোত। যে দেখল সেই বৈষ্ণব হয়ে গেল। মুখে ধ্বনি ফুটল—হরি-হরি, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, জয় কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য।

সারারাত কাটল কৃষ্ণকথায়। প্রভাত হলে প্রাতঃস্নানের পর প্রভু ভক্তদের কাছে বিদায় চাইলেন। সকলে আবার হায়-হায় করে উঠল।

কারু দিকে আর তাকালেন না। কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হয়ে রাধিকার মত চললেন বিষাদচ্ছবি হয়ে।

মুখে শুধু এক বাক্য: 'রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাম্।' এই বাক্য মুখে নিয়েই চলেছেন গৌরহরি, আর যাকেই দেখছেন, বলছেন, বলো হরি, বলো কৃষ্ণ। আলিঙ্গন করছেন আর সুযোগে শক্তি সঞ্চার করে দিচ্ছেন! আর সে তার গ্রামে ফিরে গিয়ে কৃষ্ণ বলে নাচছে, কাঁদছে, আর হাসছে, বৈষ্ণব হয়ে যাচ্ছে। তার পর অন্য গ্রামের লোক যখন তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে, সেও হয়ে উঠছে মহাভাগবত, কৃষ্ণনামের আচার্য।

এভাবে সেতুবন্ধ পর্যন্ত সমস্ত দেশ বৈষ্ণব হয়ে গেল।

ক্রমে এসে পৌছলেন কূর্মক্ষেত্রে গঞ্জামে। মন্দিরে কূর্মাবতারের বিগ্রহ দেখে স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। উর্ধ্ববাহু হয়ে নাচতে লাগলেন প্রেমাবেশে।

এখানেও সেই কৌশল। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে কৃষ্ণাগ্নি-সঞ্চার।

'কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥
এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল॥'

কূর্ম নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ আছে সেই গ্রামে, প্রভুকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করল। নিজে পা ধুয়ে দিল প্রভুর, সেই জল খেল সবংশে। অনেক স্নেহে ভিক্ষা করাল নানাপ্রকার, সবংশে খেল শেষায়। বললে, 'যে পাদপদ্ম ব্রহ্মা ধ্যান করছে, তাই আমার ঘরে অবতীর্ণ। প্রভু, তোমাকে আর আমি ছাড়ব না, বিষয়তরঙ্গে আমি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছি, আমাকে তুমি সঙ্গে নাও।'

'এসব কথা বলবে না।' বললেন প্রভু, 'ঘরে বসে নিরন্তর কৃষ্ণনাম নেবে, আর যাকেই দেখবে, তাকেই করবে কৃষ্ণ-উপদেশ। তোমাকে বিষয়তরঙ্গ স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না।'

সর্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ, বাসুদেব রাত্রে শুনতে পেল, কূর্মবিপ্রের ঘরে প্রভু এসেছেন! ভোর হতেই চলে এল তড়িঘড়ি।

'প্রভু কোথায়?'

'এই খানিক আগেই চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন!' মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল বাসুদেব।

জীবনে তার একমাত্র সঙ্গী কুষ্ঠকীট। অঙ্গের ক্ষতস্থান থেকে যদি একটি কীট মাটিতে পড়ে যায়, বাসুদেব আবার তাকে সযত্নে ক্ষতস্থানেই আশ্রয় দেয়। নিজ দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র অভিনিবেশ নেই, নিজ দেহ দিয়েই কীটগুলোকে, যেসব কীট দেহ থেকে খসে পড়েছে তাদেরও, তাদেরও সেবা-যত্ন করে, ভরণপোষণ করে। যে ঈশ্বরতন্ময়, কোথায় আর তার দেহবুদ্ধি!

বিলাপ করতে লাগল বাসুদেব।

হঠাৎ তার চোখের সামনে প্রভু এসে দাঁড়ালেন। শুধু দাঁড়ালেন

না, তাকে বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। দিলেন তাকে জ্যোতির্ময় নিরাময় স্পর্শ।

মুহূর্তে অভিনব কাণ্ড ঘটে গেল। কুষ্ঠ সেরে গেল বাসুদেবের। তার সর্ব অঙ্গ নিরবদ্য হয়ে উঠল, ধরল সুবর্ণকান্তি।

'এ শুধু তুমিই পারো।' বললে বাসুদেব। 'এ জীবের পক্ষে অসম্ভব। তুমি ভগবান, জীবনিস্তার তোমার স্বভাব, তাই তোমার মধ্যে উত্তম-অধমের ভেদ নেই, উত্তম-অধম দুইই তোমার সমান প্রিয়। কিন্তু এ আরোগ্য সর্বাংশে আমার পক্ষে শুভ হল কী?'

'কেন এ কথা বলছ?'

'আমার এখন অহঙ্কার না জন্মায়।' দ্রবচিত্তে বললে বাসুদেব, 'আগে আমি সকলের অস্পৃশ্য ছিলাম, আমার গায়ের গন্ধে কেউ আমার কাছে ঘেঁসত না, নিজেকে ভাবতে পারতাম দীনাতিদীন বলে। তুমি এখন আমার দেহকে নিষ্কলঙ্ক করলে, রূপে লাবণ্যে গরীয়ান করলে, এখন আমাতে দেহাভিমান না এসে যায়। আর তুমি তো জানো অভিমানই ভজনের শত্রু।'

'তুমি সর্বদা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো, কৃষ্ণ-ধ্বনিতেই জন্মাবে না অভিমান। কৃষ্ণই তোমাকে আত্মসাৎ করে নেবেন।'

প্রভু চললেন এগিয়ে। নষ্ট-কুষ্ঠ রূপপুষ্ট হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, হয়ে গেল ভক্তিতুষ্ট। প্রভুর নাম হল বাসুদেবামৃতপদ।

জিয়ড়-নৃসিংহের স্থানে পৌঁছুলেন তার পর। এই নৃসিংহ প্রহ্লাদের স্থাপনা। দণ্ডবৎ নতি করলেন প্রভু। বহু নৃত্যগীতস্তুতি করলেন। সিংহ যেমন অন্যের সম্পর্কে উগ্র হয়েও নিজের শাবকদের কাছে শান্ত, তেমনি নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুর মত ভক্তদ্রোহীর প্রতি উগ্র হয়েও প্রহ্লাদের মত ভক্তের কাছে স্নেহশীল।

প্রহ্লাদ তার বন্ধুদের বললে, 'তোমরা যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান হও, তা হলে শ্রদ্ধা হতেই তোমাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধি উৎপন্ন হবে। আমি বলছি, যাতে ভগবানের অবিচলিত আসক্তি হয়, তাই

করো। শুশ্রূষা করো, সমস্ত লব্ধবস্তু সমর্পণ করো, সাধু ভক্ত-বৃন্দের সংসর্গ করো, ভগবৎকথায় অনুরাগী হও, সশ্রদ্ধ হও, ধ্যান করো তাঁর পাদপদ্ম। যেখানে তাঁর যত মূর্তি আছে, বহুমূর্ত্যেক-মূর্তি, সমস্ত দর্শন-পূজন করো। ভগবান সর্বভূতে বর্তমান—তাই জেনে সর্বভূতে সাধুদৃষ্টি করো। তা হলেই দেখবে বাসুদেবে আসক্তি আসবে। দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, চরিত্র, বহুজ্ঞতা, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত—মুকুন্দের প্রীতি-উৎপাদনে সমর্থ নয়, একমাত্র নির্মল ভক্তিতেই হরি আনন্দিত হন। গোবিন্দে একান্ত ভক্তি আর তাঁকে সর্বত্র নিরীক্ষণ করাই ইহলোকে পুরুষের পরমস্বার্থ। ভক্তি ছাড়া আর সমস্তই বিড়ম্বনা।

মানবজন্ম প্রয়োজনসাধক। যেহেতু মানবজন্ম দুর্লভ ও অনিত্য, কৌমারকালেই ভাগবতধর্ম আচরণ করো। আরো বললে প্রহ্লাদ। বিষ্ণু সর্বভূতের প্রিয় ও সুহৃদ। দেহসম্বন্ধ থেকে ইন্দ্রিয়সুখ অনায়াসেই পাওয়া যায়, এতে মঙ্গল নেই, শুধু আয়ুক্ষয়। একমাত্র ভগবানের চরণাম্বুজসেবনেই মঙ্গল। সেই আদ্য অনন্ত অধোক্ষজ যদি তুষ্ট হন তা হলে আর কী অলভ্য থাকে? পরিণামে যা হবেই যা অবশ্য-সিদ্ধ সেই সমস্ত ধর্মচেষ্টায় কী ফল? আমরা যারা নিরন্তর তাঁর নামকীর্তন করছি ও চরণসংলগ্ন আছি, আমাদের মোক্ষ দিয়েই বা কী হবে?

আয়ু মাত্র শতবৎসর। তার অর্ধেক ব্যয় হয় নিদ্রায়, অন্ধতমসে, নিষ্ফলশয়নে। বিশ বছর যায় বাল্যমোহে ও কৈশোরক্রীড়ায়, বিশ বছর জরাজীর্ণতায়, আর বাকি জীবন গৃহাসক্ত অবস্থায়, তাপত্রয়ে, দুরন্ত মোহে। কেশকার কীট যেমন নিজ বাসস্থান নির্মাণ করে নিজের বহির্গমনের জন্যেও দ্বার রাখে না তেমনি গৃহসুখমত্ত সংসারীরা আপন লোভজালেই বদ্ধ হয়ে পড়ে। মুকুন্দের শরণাগতিই এই পরম ক্লেশকর অবস্থা থেকে মুক্তির উপায়। ভগবান অচ্যুত সর্বভূতের আত্মা ও স্বতঃসিদ্ধ বলে তাঁকে প্রীত করা কঠিন নয়। তা স্বভাবেরই বস্তু।

পরতত্ত্ববস্তু একেই বহু, আবার বহুতেও এক। তাই যেখানে যত মন্দির পেয়েছেন—ভগবতীর কি ভৈরবীর, বিষ্ণুর কি নৃসিংহের, দর্শন করেছেন প্রভু। আর সর্বত্রই তাঁর প্রেমাবেশ। যদিও কৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনের জন্যেই তাঁর অবতার, সেই আস্বাদনে পূর্ণতা কই যদি অন্য ভগবৎস্বরূপের মাধুর্যও না আস্বাদিত হয়? কোনো ভগবৎ-স্বরূপই উপেক্ষণীয় নয়। বিভিন্নস্বরূপে ভেদবুদ্ধি করলে অপরাধ। ঈশ্বরত্বে তাই প্রভুর সর্বত্র প্রেমাবেশ।

একরাত সেখানে থেকে আবার চললেন দক্ষিণে। গোদাবরীর তীরে এসে দাঁড়ালেন। এ কি, যমুনা নাকি? আর চারদিকের এই ঘন বন, এই বুঝি ব্রজভূমি! মাতোয়ারা হয়ে নাচতে লাগলেন। আবার এ অঞ্চলও বৈষ্ণবায়িত হল।

পার হলেন গোদাবরী। ঘাটে স্নান করে অদূরে বসলেন কৃষ্ণ-কীর্তন করতে।

হঠাৎ বাজনা বেজে উঠল, দোলায় চড়ে কে আসছে রাজরাজড়া। সঙ্গে বহুতর ভৃত্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ, সৈন্যসামন্ত। অনেক ঠাটবাট। আসছে স্নান করতে, কিন্তু বিষয়-বিলাসের ঘনঘটা কত!

প্রভু জানেন এ কে। এ উৎকলবাসী, বিদ্যানগরের অধিপতি রামানন্দ রায়। বিষয়ে বসবাস করেও নিরাসক্ত। কৃষ্ণপ্রেমে টলমল।

বিধিমত স্নান-তর্পণ করল রামানন্দ। হঠাৎ নজরে পড়ল অদূরে একাকী কে এক সন্ন্যাসী বসে আছে। সন্ন্যাসী সম্বন্ধে রামানন্দ বিশেষ উৎসাহিত নয়, কিন্তু কে এ অপরূপ? অরুণবর্ণ বহির্বাস, কমলচক্ষু, সুবলিত প্রকাণ্ড শরীর, শরীরে শত সূর্যের তেজ। সমস্ত বন-বিটপী আলো করে বসে আছে। শুধু চোখেই চমৎকার লাগল না, প্রাণেও বাঁশি বেজে উঠল। রামানন্দ এগোল দ্রুত পায়ে, একেবারে দণ্ডবৎ ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করল প্রভুকে।

তাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে প্রভুও সতৃষ্ণ হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওঠো। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো।'

উঠল রামানন্দ। সহর্ষচোখে তাকিয়ে রইল।

'তুমিই রামানন্দ?'

দৈন্যবশে রামানন্দ বললে, 'আমিই সেই মন্দভাগ্য শূদ্রাধম।'

'তুমি?' কতদিনের হারানো বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছেন—সেই উদ্বেল আনন্দে দীর্ঘ দৃঢ় ভুজে রামানন্দকে প্রভু বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন! দুজনেরই স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হল—প্রভুর রাধাভাব, রামানন্দের গোপীভাব। পরস্পরকে আলিঙ্গন করে দুজনেই পড়লেন মাটিতে—স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য তো ফুটলই, মুখে ফুটল গদগদ শব্দ—কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

এ কী আচরণ! বৈদিক ব্রাহ্মণেরা স্তম্ভিত হল। তেজপুঞ্জ-কলেবর সন্ন্যাসী, অথচ শূদ্রকে আলিঙ্গন করছে! আর স্বভাবতই গম্ভীর যে রাজপুরুষ, সেই রামানন্দ সন্ন্যাসীস্পর্শে করছে এমন আকুলি-ব্যাকুলি!

বিরোধীয় ভাবের লোক দেখে প্রভু ভাব সম্বরণ করলেন। সুস্থ হয়ে বসলেন রামানন্দকে পাশে নিয়ে। বললেন, 'সার্বভৌম ভটচাজ তোমার কথা বলেছিলেন আমাকে। বলেছিলেন দেখা করতে। ভালোই হল, অনায়াসে তোমার দর্শন পেলাম।'

'আজ আমার মনুষ্যজন্ম সফল হল।' বললে রামানন্দ। 'সার্বভৌমের কৃপায় আমি ভাগ্যবান হলাম, পেলাম চরণদর্শন। তার প্রেমে বশীভূত হয়ে আমার মত অস্পৃশ্যকে তুমি আলিঙ্গন করলে। বেদবিধি ভয় করলে না, আমার মত বিষয়ী রাজসেবী শূদ্রকেও তোমার বুকে স্থান দিলে। সন্দেহ কী, তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর, জীবের প্রতি কৃপায় নিন্দ্যকর্ম করতেও তোমার বাধে না।'

'কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
মোর দরশন তোমা—বেদে নিষেধয়॥

তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি—কে জানে তোমার মর্ম॥'

আরো বললে রামানন্দ, 'আমাকে উদ্ধার করতেই তোমার এখানে আসা। তুমি যে পরম দয়ালু, তুমি যে পতিত-পাবন। মহাপুরুষেরা নিজের আশ্রম ছেড়ে অন্যত্র যায় কেন? তাদের নিজের প্রয়োজনে নয়, শুধু পাষণ্ড-উদ্ধারে। যায় কেন তীর্থ-পর্যটনে? শুধু তীর্থকে পবিত্র করতে, আর সেই ছলে সংসারীদের নিস্তার করতে।'

বিদুরকেও তাই বলেছিল যুধিষ্ঠির। বলেছিল, 'আপনার মত কৃষ্ণভক্ত তীর্থের মতই পবিত্র। যাদের অন্তরে গদাধর বিরাজমান, তাদের তীর্থদর্শনে প্রয়োজন কী। শুধু তীর্থের পবিত্রতা বাড়াবার জন্যেই তাদের তীর্থভ্রমণ।'

'দেখ, তোমাকে দেখে আমার অনুচরেরা, ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত দ্রবীভূত হয়েছে।' রামানন্দ আরো বললে, 'কৃষ্ণনাম শুনে সকলের শরীর শিহরিত, চোখ অশ্রুসজল। তোমার আকৃতিতে-প্রকৃতিতে ঈশ্বর-লক্ষণ সুস্ফুট, সামান্য জীবে এ কখনো সম্ভব নয়।'

'কী যে বলো'।' বললেন প্রভু, 'তুমি মহাভাগবত, তোমার ভক্তি দেখেই ওদের মন আর্দ্র হয়েছে। অন্যের কথা ছেড়ে দিই, আমি হেন যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তির ধার ধারি না, আমিও তোমার স্পর্শে ভাসছি কৃষ্ণপ্রেমে। সার্বভৌমই বলে দিলেন, আমার কঠিন চিত্তকে শোধন করবার একমাত্র রসায়ন তুমি, তাই তো এসেছি তোমাকে দেখতে।'

কিন্তু এখানে থাকি কোথায়?

এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ তাঁর ঘরে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন।

প্রভু হাসিমুখে বললেন রামানন্দকে, 'বড় সাধ তোমার মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনি। আবার দেখা হবে তো?'

'কিছুদিন এখানে থাকুন।' বললে রামানন্দ, 'এই দুষ্টচিত্তকে মার্জন করে শোধন করে দিয়ে যান।'

'আপনারা সংসারতপ্ত ব্যক্তিদের পরমবন্ধু।' সনৎকুমারকে জিগগেস করল মহারাজ পৃথু : 'আপনারা বলে দিন সংসারে কী উপায়ে মানুষের মঙ্গল হবে।'

'শ্রীহরিচরণে দুরাপা রতিই অন্তরের কামমলকে বিধৌত করে। শাস্ত্র দ্বারা যা নিশ্চিত হয়েছে, আত্মা ভিন্ন সে সমস্ত পদার্থে বৈরাগ্য আর গুণাতীত আত্মায় দৃঢ়া রতিই মানুষের শ্রেয়োলাভের হেতু। শ্রদ্ধা, চর্যা, জিজ্ঞাসা, নিষ্ঠা, উপাসনা, পুণ্যশ্লোক হরির পবিত্র কথা, তামস ও রাজস ব্যক্তিদের সঙ্গে সহবাস-অনিচ্ছা, নির্জনবাসে অভিরুচি, অর্থকামবর্জন ও আত্মাতে পরিতোষ—এ সমস্তে অনায়াসেই আত্মরতি ও আত্মভিন্নে অনাসক্তি জন্মাতে পারে। আর মুকুন্দচরিতামৃতাস্বাদন, হরিভক্তদের কর্ণালঙ্কারস্বরূপ হরিনাম বারংবার উচ্চারণ, এরাও দেয় শ্রেয়োফল। কর্মগ্রন্থি ও হৃদয়গ্রন্থি যদি ছিন্ন করতে চাও তবে সেই চরমশরণ বাসুদেবের ভজনা করো।

যাতে হরির পরিতোষ হয় সেই কর্মই কর্ম, যার দ্বারা ভগবানে মতি জন্মে সেই বিদ্যাই বিদ্যা। ভগবানের পাদমূলেই আশ্রয়, পাদমূলেই কল্যাণ।

৪৫

দেরি নয়, আজ সন্ধ্যাতেই দেখা করব। ভাবছে রামানন্দ। প্রভু ভাবছেন, কতক্ষণে না জানি দেখা পাই। সন্ধ্যা হতেই যেন চলে আসে।

সান্ধ্য স্নান সেরে প্রভু বসে আছেন, রামানন্দ রায় উপস্থিত। রামানন্দ নমস্কার করল, প্রভু আলিঙ্গন করলেন।

নির্জনে বসে আলোচনা সুরু করলেন দুজনে।

. 'জীবের কাম্য বা সাধ্য বস্তু কী?' জিগগেস করলেন প্রভু, 'শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ বলো।'

শুধু তোমার কী অনুভূতি, তা নয়, শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও প্রকাশ করো। অর্থাৎ শাস্ত্রবচনের সঙ্গে তোমার নিজের অনুভবকে মেলাও।

রামানন্দ বললে, 'স্বধর্মাচরণই সাধ্য। তাই বলেছে বিষ্ণুপুরাণে। অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুষ্ঠানেই বিষ্ণুপ্রীতি। যে যে-আশ্রমে যে-ভূমিতে আছে, সেই আশ্রমের বা সেই ভূমির বিহিত কাজ পালন করলেই বিষ্ণুর সন্তোষ।'

প্রভু বললেন, 'ইহ বাহ্য, আগে কহ আর। মহত্তর সাধ্যের কথা শুনতে চাই।'

'কৃষ্ণে কর্মার্পণ।' বললে রামানন্দ, 'শুধু সাধ্য নয়, সাধ্যসার। অর্থাৎ যা কিছু কাজ করো সব কৃষ্ণে অর্পণ করো। তোমার অধিকার কর্মে, ফলে নয়। যে কর্মের ফল কৃষ্ণের সুখে নয়, নিজের সুখে নিয়োজিত, তা অকর্ম।'

'এও বাহ্য এও বাইরের দরজা,' বললেন প্রভু, 'আগে কহ আর। অন্দরমহলের দ্বার দেখাও।'

'স্বধর্মত্যাগ—সর্বধর্মত্যাগ।' রামানন্দ বললে। 'কর্ম করে ফল অর্পণ নয়, কর্ম করবার আগেই আত্মসমর্পণ। ফলদান নয়, আত্মদান। গীতায় যাকে বলেছে,—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। যে নিজেকে দিয়েছে, তার আর ধর্ম থাকল কই? তার তখন স্ব-ও গেছে, ধর্মও গেছে। আত্মসমর্পণই শ্রেষ্ঠ সাধ্য।'

প্রভু আরো এগোতে চাইলেন। বললেন, 'এও বাহ্য, আগে বলো।'

সমর্পণ যে করবে, পূর্বাহ্নে জানতে হবে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র শরণ্য, একমাত্র আশ্রয়স্থল। না জেনে সমর্পণে সার্থকতা কী। শুধু উপদেশ শুনে শরণাগত হবে? পাপ-পুণ্য বিচার করে? মুক্তি-ভুক্তির